শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক কেন ?

বেদ-গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ

শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক কেন ?

পুস্তকটির লেখক আর্য সমাজের নয়। কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে যুক্তিসঙ্গত ভাবে মহাভারতের সাথে তুলনা করে ভাগবতপুরাণ যে মহর্ষি ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত নয় তা প্রকাশ পেয়েছে। যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে কলঙ্কমুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন লেখক। শুধুমাত্র এই কারণেই, সকলকে সত্য সম্পর্কে অবহিত করার ইচ্ছায় আমি এই পুস্তকের পুনরায় সংস্করণ করেছি, তৎসহিত লেখকের লেখনীতে মহাভারতাদি শাস্ত্রের রেফারেন্স যুক্ত করে পুস্তককে অধিক বিচারশীল করে তুলতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীনবকুমার দেবশর্মা নিয়োগী

প্রণীত

শ্রী রজিৎ চন্দ্র বর্মন

পুনর্লিখন ও টিপ্পনী সংযুক্ত

বেদ গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ

(সর্বদা সত্য ও ধর্মের পথে)

শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক কেন ?

(মহাভারত এবং ভাগবতের তুলনামূলক একটি আলোচনা)

প্রচ্ছদ ও অক্ষরবিন্যাস
বেদ গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ

প্রকাশকাল
১৩০৩ বঙ্গাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ (সংশোধিত)
১৪৩১ বঙ্গাব্দ

॥ এই গ্রন্থটি বিদ্বেষমূলক ভাবধারায় পাঠ না করার অনুরোধ রইল ॥

॥ গ্রন্থটির বানান সংশোধনে সহায়তা করেছেন **ধনঞ্জয় অধিকারী অঙ্গি** দাদা। ॥

॥ সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ ॥

গ্রন্থের উদ্দেশ্য

খ্রীষ্টান মিশনরীগণ তাঁদের স্বধর্ম প্রচার ও দলপুষ্টির হেতু হিন্দুর প্রাণের প্রাণ, অথবা হিন্দু-প্রাণের যথাসর্বস্ব যে কৃষ্ণ চরিত্রে লম্পট আদি নানা দোষ উল্লেখে স্থানে স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত হিন্দু-সন্তানদিগের মন যা শ্রবণে কখনো বিচলিত, কখনো বা একবারেই ধর্মচ্যুত হয়ে পড়তেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই কৃষ্ণ-চরিত্র অশেষ শেষের আকর কি না, তা প্রদর্শনার্থই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অবতারণা।

কৃষ্ণ-চরিত্রে দোষ দেখানোর পক্ষে খ্রীষ্টান মিশনরীদিগের একমাত্র অবলম্বন শ্রীমদ্ভাগবত। গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতে হিন্দুর আরাধ্য-ধন শ্রীকৃষ্ণকে শঠ, লম্পট, ধূর্ত্ত, চোর, পরস্ত্রী অপহারক এবং আরও কত কি বলেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। মিশনরীগণও সেই ধুয়া ধরেই হাটে, মাঠে, ঘাটে, পথে, বাজারে, বন্দরে, সর্বত্র গেয়ে বেড়াচ্ছেন, "শ্রীকৃষ্ণ চোর, ধূর্ত্ত, শঠ, লম্পট ইত্যাদি"। হিন্দুগণ বুঝতে না পেরে ভালমন্দ বিচার না করে, অন্ধবিশ্বাসে তাঁহাদেরই পুরাণে লিখিত অমন শঠের গুরু, চোরের শিরোমণি, লম্পটের লম্পট, ধূর্ত্তের ধূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান জ্ঞানে আরাধনা করে, ভক্তিযোগ সহকারে তাঁহারই শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেয় এবং অন্তিমেও সেই পদেই লয় পাবার আকাঙ্ক্ষা রাখে। তাঁহারা যদি হিন্দুর শাস্ত্র দ্বারাই হিন্দুর উপাস্য দেবের অনন্ত দোষ প্রমাণিত করতে পারেন, তবে তাহা শুনে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত হিন্দুর প্রাণ চমকে উঠবে তাতে ভক্তির পরিবর্তে অভক্তির স্রোত বইবে, ইহা বিচিত্র কি ? জঘন্য প্রকৃতিতে কে প্রাণ ঢালিয়া দেয় ? তাঁহাকে ইষ্টজ্ঞানে আরাধনা করতেই বা কাহার প্রবৃত্তি জন্মে ? অতএব এক্ষণে দেখা আবশ্যক হচ্ছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পুরাণ লেখক মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের লেখনী প্রসূত নাকি কৃষ্ণ-বিদ্বেষী অন্য কোনো আধুনিক লেখকের কপোল কল্পিত। বিচারত যদি তাহা মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের লেখনী প্রসূত বলেই সাব্যস্ত হয়, তাহলে তো কোন কথাই নাই। তখনই স্বীকার করতে হবে যে, কৃষ্ণ চরিত্র কলঙ্কের আবাসভূমি, শ্রীকৃষ্ণ নরকের কীটবিশেষ। আর যদি তাহা না হয়, তবে ঐ সকল কল্পিত নিন্দাবাদ শুনে, যে সমস্ত হিন্দুর প্রাণ বিচলিত হচ্ছে, অথবা একবারেই ধর্মচ্যুত হয়ে পড়তেছে; তাহাদের যে শেষগতি কি হবে তাহা সেই গতি বিধাতা ভগবান জানেন।

একে তো শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার অবধি উহার লেখক সম্বন্ধে লোকের বিষয়ে সন্দেহ চলে আসতেছে, তাহার পর যদি তৎ লিখিত কৃষ্ণ-চরিত্রের সঙ্গে মহাভারত এবং মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের কৃষ্ণ-চরিত্রের তুলনা করা যায়, তাহলে এমন পাষণ্ড,

এরূপ মূর্খ কে আছে, যে বিশ্বাস করতে পারে, উভয় চরিত্র এক-লেখনী-প্রসূত একই ছাঁচে ঢালা ? মহাভারত এবং মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের কৃষ্ণ সাধু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক, অদ্বিতীয় বীরপুরুষ, ধর্মরক্ষক, ধর্মপালক এবং দুষ্ট-সংহারক। শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ লম্পট, ধূর্ত্ত, চোর, পরস্ত্রী-অপহারক, মোটের উপরে অতি অপাত্র বা অপবিত্র। মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন যে তুলিকায় মহাভারত এবং হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তমরূপে অমন সুন্দররূপে এঁকেছেন, তিনিই আবার সেই তুলিকায় সেই শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমদ্ভাগবতে ওরূপ জঘন্য আকৃতিতে আঁকবেন, ইহা কি সম্ভব ? তাহলে আর তাঁহার মহত্ত্ব রক্ষা পায় কিসে ? তাই বলি, শ্রীমদ্ভাগবত কখনও মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের লেখনী-সম্ভূত বলে বোধ হয় না, উহা আধুনিক অন্য কোনও গ্রন্থকারের গ্রন্থ। তিনি উদ্দেশ্যমূলে ভগবানের নির্মল যশ বর্ণনা করতে গিয়ে কার্যত তাঁহাকে লাম্পট্যাদি অশেষ নীচভূষণে সাজিয়েছেন, এবং গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধি জন্য উহাতে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নাম সংযোগ করে দিয়েছেন।

মহাত্মা-কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন প্রণীত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ভাগবত নামে যে পঞ্চম পুরাণ খানি রয়েছে, এই শ্রীমদ্ভাগবত সেই ভাগবত কি না, অথবা ইহা পুরাণ বহির্ভূত, তাঁহারই হস্তলিখিত কোন ধর্মগ্রন্থ, তাহারও বিচার করা সঙ্গত হচ্ছে। যদি ইহা মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নামে কৃত্রিম বলেই স্থির হয় এবং ধর্মগ্রন্থ হতে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হলে নিঃসংশয়ে মহাভারত এবং হরিবংশের কৃষ্ণ-চরিত্রের পবিত্রতা যে সর্ব্বাংশে পরিরক্ষিত হবে, তাহার আর সন্দেহ কি ? কিন্তু বিষয়ের বিশেষ গুরুত্ব এবং আমার অতি অক্ষমতা, এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি করতে গেলে উদ্দেশ্য সাফল্যের পক্ষে গভীর সন্দেহ। তার পর শ্রীমদ্ভাগবতে চিরগ্রথিত থাকাতে ভগবানের যে সমস্ত কুৎসা দীর্ঘকাল যাবৎ সাধারণের চিত্রপটে বজ্রাক্ষরে অঙ্কিত রয়েছে; আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর ব্যক্তির ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তে তাহা যে সহজে কাহারো অন্তঃকরণ হতে অপসারিত হবে, এরূপ আশা করাও মূর্খতার পরিচায়ক বৈ আর কি হতে পারে ? তবে যিনি বিশ্বাত্মা, ভগবান, তাঁহারই মহৎ যশ রক্ষার্থে প্রযত্ন করা যে অতিব উচ্চতর কর্তব্য...তাহার উপর নির্ভর করেই আমি এই অসম সাহসিকতার কর্মে প্রবৃত্ত হলাম। আমা দ্বারা যদি ভগবানের মাহাত্ম্য কিয়ৎ পরিমাণেও প্রকাশ পায় ও তাহা সাধারণের ন্যায় চক্ষে নিপতিত হয়, তাহলেই কৃতার্থমন্য হবো।

— শ্রীনবকুমার দেবশর্মা নিয়োগী

ভূমিকা

এসেছি একা, যাবোও একা। আমার বলে, আমার চিহ্ন কিছুই থাকবে না; থাকবারও নয়। থাকবে কেবল ভগবানের মহিমা ও মাহাত্ম্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই মহিমা ও মাহাত্মে যে সকল আবর্জনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার মানস সমার্জনী কর্তৃক সেই আবিলতা কিয়দংশেও দূরীভূত ও পরিষ্কৃত হতে পারে কিনা, জীবনের শেষভাগে, তাহাই চিন্তা ও চেষ্টার বিষয়। জানি না, সেই কৃপানিধি ভগবানের অপার কৃপায়, এই আকাঙ্ক্ষার বিন্দুমাত্রও সম্পূর্ণ হতে সমর্থ হবো কি না। তবে ভরসা সেই ভগবান, ধার্মিক ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন। অতএব বিনীত প্রার্থনা, ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সৎ ও ন্যায়দৃষ্টিতে আমার এই আকাঙ্ক্ষার ফল গ্রহণ করলেই চরিতার্থ হবো।

— **শ্রীনবকুমার দেবশর্ম্মা নিয়োগী**

সূচীপত্র

— ✪✪✪ —

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-কৃত পুরাণ-সংখ্যার বচনে যে সমস্ত পুরাণের নাম আছে, তার মধ্যে ভাগবত নামে পঞ্চম পুরাণ খানিই শ্রীমদ্ভাগবত কি না ?

পুরাণ-সংখ্যার বচন —

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং চ শৈবং ভাগবতং তথা।
তথান্যং নারদীয়ং চ মার্কণ্ডেয়ং চ সপ্তমম্॥
আগ্নেয়মষ্টমং চৈব ভবিষ্যন্নবমং স্মৃতম্।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্॥
বারাহং দ্বাদশং চৈব স্কান্দং চাত্র ত্রয়োদশম্।
চতুর্দশং বামনং চ কৌর্মং পঞ্চদশং তথা॥
মাৎস্যং চ গারুড়ং চৈব ব্রহ্মাণ্ডং চ ততঃ পরম্।

[বিষ্ণু পুরাণ ৩/৬/২১-২৪]

সরলার্থ – প্রথম পুরাণ ব্রাহ্ম, দ্বিতীয় পদ্ম, তৃতীয় বৈষ্ণব (বিষ্ণু), চতুর্থ শৈব (শিব), পঞ্চম ভাগবত, ষষ্ঠ নারদীয় এবং সপ্তম মার্কণ্ডেয় ॥ এই প্রকার অষ্টম আগ্নেয়, নবম ভবিষ্যৎ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত এবং একাদশ পুরাণ লৈঙ্গ (লিঙ্গ) বলা হয় ॥ তথা দ্বাদশ বরাহ, ত্রয়োদশ স্কন্ধ, চতুর্দশ বামন, পঞ্চদশ কৌর্ম, তথা এরপর মৎস্য, গড়ুর এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ রয়েছে। হে মহামুনি ! এগুলোই হলো আঠারো মহাপুরাণ ॥

এই পুরাণ সংখ্যার বচনের তৃতীয় স্থানে যে বৈষ্ণব পুরাণ বলে উল্লিখিত হয়েছে, যাহা বিষ্ণুপুরাণ নামে বিখ্যাত, তাহা কখনও শ্রীমদ্ভাগবত বলে লক্ষিত হতে পারে না। তবে ভাগবত নামে যে পঞ্চম পুরাণ খানি রয়েছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত কি না, তা একটু বিশেষ বিবেচ্য। আমার বিবেচনায় কিন্তু তাহাও সম্ভবপর নয়। কেননা, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, ইহার পরক্ষণে ভাগবতপুরাণ বললে তাহা ভগবতী-সম্বন্ধীয় পুরাণ বলে মনে করাই একান্ত ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। কারণ, যে স্থলে ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ রয়েছে, সে স্থানে শক্তিপুরাণ (ভগবতীপুরাণ) থাকবে না, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব বলি, ভাগবতপুরাণ কদাপি শ্রীমদ্ভাগবত নহে; উহা ভগবতীপুরাণ। ভগবতী শব্দ–ষ্ণ প্রত্যয় করেই ভাগবত পদ সিদ্ধ হয়েছে এবং তাহাই এই পঞ্চম পুরাণ। বিশেষত শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম শ্লোকে আছে যে, পরাশর-নন্দন ভগবান ব্যাস অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং বহুবিধ পুরাণ প্রণয়ন করেও তৃপ্তিলাভ করতে পারছেন না, ইত্যাদি।

বহুবিধ পুরাণ শব্দে পুরাণ উপপুরাণ সমস্তই বুঝা যাচ্ছে। কেননা, অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন, তৎপরে বহুবিধ পুরাণ পরিসমাপ্ত করে, অবশেষে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেছেন; সুতরাং সেই ভাগবত পুরাণ-উপপুরাণ-সংখ্যার যে অন্তর্নিবিষ্ট নয়, ইহা নিশ্চিত কথা। তাহা হলেই বলতে হবে শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ উপপুরাণ ছাড়া স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ।

প্রকৃত পক্ষে ঐ শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস লিপিবদ্ধ করেছেন, নাকি তাঁহারই নামে অন্য কোনো কবি কোন সম্প্রদায় গঠন অথবা পোষণের জন্য লিখেছেন, ইহার বিচার হওয়া আবশ্যক। তাহাতে এই তর্ক উঠতে পারে যে, ব্যাসদেবের নামে কৃত্রিম করতে হলে ভাগবত পুরাণ নাম করলেই যথেষ্ট হতে পারতো। তাহা না করে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বলে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নামে কৃত্রিম করলেন কেন ? এই তর্কের মীমাংসা, শ্রীমদ্ভাগবত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-কৃত কি না, ইহার বিচারে যে সমস্ত কথা উঠিবে, তাহারই মধ্যে প্রস্ফুটিত হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে —

একদা মহর্ষি নারদ, পরাশর-নন্দন ব্যাস সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁহার ম্লানমূর্ত্তি-দর্শনে তাঁহাকে বললেন, 'তুমি মহাভারত আদি প্রণয়ন করেছ। কিন্তু তাহাতে ভগবানের নির্মল যশ বর্ণনা কর নাই। অতএব ভগবানের গুণ বর্ণনা করে আর একখানি গ্রন্থ রচনা কর।'

[ভাবার্থ~ শ্রীমদ্ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়]

এতে মহর্ষি ব্যাসদেব ঐ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করলেন। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত যে মহাভারত এবং মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের পরবর্তী গ্রন্থ, এতে মহাভারত কিংবা হরিবংশের কোনও একটি কথাও যে উদ্ধৃত হবার কথা নহে, তাহা অবধারিত। কেননা, মহাভারতে ও হরিবংশে যে সমস্ত কাহিনি রহেছে, তাহাতে ভগবানের নির্মল যশ বর্ণনা হয় নাই; তাই মহর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে আর একখানি গ্রন্থ লিখতে বলেছিলেন। সুতরাং মহাভারত হরিবংশের কাহিনি উদ্ধৃত করে শ্রীমদ্ভাগবত লিখলে আর তাহাতে ভগবানের নির্মল যশের বর্ণনা হয় কীরূপে ?

মহাভারত এবং মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশ যে মহর্ষি ব্যাসদেব-কৃত, তাহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। সুতরাং মহাভারতে হরিবংশে যখন শ্রীকৃষ্ণ দেবকী-নন্দন বলেই প্রকাশ আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে যদি সেই শ্রীকৃষ্ণকে রোহিণী গর্ভ সম্ভূত দেখতে পাই,

≈≈

অথবা মহাভারত-হরিবংশের উদ্ধৃত প্রস্তাব গুলিতে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যয় দেখি, তথাপি কী সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাস-কৃত ? মহাভারতে হরিবংশে যে শ্রীকৃষ্ণকে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক, ধর্মরক্ষক এবং ধর্মপালক দেখতে পাই, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই শ্রীকৃষ্ণকে চোর, ধূর্ত, লম্পট, পরস্ত্রী-অপহারক, মিথ্যাবাদী, অধার্মিক দেখিয়াও কি বলা যাবে যে, এর দ্বারা ভগবানের নির্মল যশ কীর্তিত হয়েছে ? এই গ্রন্থ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাস-প্রণীত ?

শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্যে এমন কথা নাই যে, মহাভারত ও হরিবংশের প্রস্তাবগুলি অতি বিপর্যয় রূপে উদ্ধৃত করে শ্রীমদ্ভাগবত নাম দিলেই ভগবানের নির্মল যশ প্রকাশিত হবে। উদ্দেশ্যে তাহা নাই, সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৃত কি না, সেই মহাত্মা-কৃত মহাভারত ও মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের সহিত তাহার পরীক্ষা করা ও শ্রীমদ্ভাগবতের কথার সহিত বিচার করে নেওয়াই সর্বদা সঙ্গত বোধ হয়।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

★★ যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট রূপে লিখিত রয়েছে যে, মহর্ষি ব্যাসদেব পূর্বে মহাভারত রচনা করেছেন এবং পরবর্তীতে ভাগবত রচনা করেছেন। [ভাগবত ১/১/১ এর পূর্বে যাকে মাহাত্ম্য বলা হয়]। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র, তাঁর আচরণ, সেই সময়কার ঘটনাও ভাগবতে অনুরূপভাবে থাকবে। কেননা যেহেতু একজন ব্যক্তিই উভয় গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেইহেতু উভয় গ্রন্থে একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন রূপে লক্ষিত হতে পারে না। যদি এরূপ হয় তবে বুঝতে হবে এখানে বিবেচ্যযোগ্য, এবং ভাগবত মহর্ষি বেদব্যাস কৃত নয়।

— ✰ —
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

≈≈

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে —

অশ্বত্থামার শিরোমণি-কর্তন

কুরু-পাণ্ডবীয় মহাসমরে উভয় পক্ষের বীরগণ স্বর্গারোহণ করলে, ভীমসেন গদা প্রহারে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেন। তৎকালে অশ্বত্থামা, প্রভু দুর্যোধনের তুষ্টিসাধন জন্য নিশীথ সময়ে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে দ্রৌপদীর নিদ্রা ভূত পঞ্চ শিশুর শিরশ্ছেদ পূর্বক তাহা দুর্যোধনের নিকট এনে দিলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাহাতে সন্তুষ্ট হলেন না। দ্রৌপদী পুত্রশোকে উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন। তখন অর্জুন তাঁকে সান্ত্বনা-বাক্যে বলেন, ভদ্রে ! আমি গাণ্ডীব-মুক্ত শর দ্বারা অশ্বত্থামার মস্তক ছিন্ন করে এখনই তোমাকে এনে দিচ্ছি। তুমি সেই মস্তকোপরি আরোহণ পূর্বক স্নান করিও, তাহা হলেই তোমার পুত্র-শোক নিবারিত হবে। তৎপরে অর্জুন রথারোহণে অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন। অশ্বত্থামা দূর হইতে অর্জুনকে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, মহাদেবের ভয়ে ব্রহ্মার ন্যায় পলায়নোদ্যত হলেন এবং তাঁহার প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করলেন। তদ্দর্শনে অর্জুন প্রাণনাশের আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করতে লাগলেন এবং তাঁহারই উপদেশে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। উভয় অস্ত্রের প্রভাবে একবারে সৃষ্টি-ধ্বংসের সম্ভাবনা দেখে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জুন উভয় অস্ত্র সংহার করলেন ও অশ্বত্থামাকে যজ্ঞীয় পশুর ন্যায় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে স্বীয় শিবিরামুখে প্রত্যাবৃত্ত হলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পার্থ ! এই অধম ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদন কর; ইহাকে জীবিত রাখা উচিত নহে। তুমি পাঞ্চালীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছ যে, ইহার ছিন্ন মস্তক নিয়ে তাঁহাকে দিবে, ইহা আমি স্বকর্ণে শুনেছি। এ ব্যক্তি পাপিষ্ঠ, শীঘ্র ইহাকে বধ কর। এই পাপিষ্ঠ কেবল শুধু আমাদের অপকার করেছে এমন নয়, দুর্যোধনেরও মহান অপকার করেছে। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মার্থ প্রদর্শন পূর্বক এই প্রকারে বারংবার প্রবৃত্তি জন্মাইলেও অর্জুন পুত্রঘাতী অশ্বত্থামার প্রাণ বিনাশ করলেন না। তাঁহাকে নিয়ে পাঞ্চালীর হস্তে সমর্পণ করলেন। তখন সুশোভনা দ্রৌপদী গুরু-পুত্রকে পশুর ন্যায় রজ্জু-বন্ধ দেখে সদয়হৃদয়ে তাঁহার চরণে প্রণতা হলেন এবং তাঁহার রজ্জু-বন্ধনে অসহ্য কষ্ট জ্ঞান করে ভর্তাকে বলেন, নাথ ! এই ব্রাহ্মণকে বন্ধন-মুক্ত করুন। ইনি আমাদিগের গুরু, যাঁহার নিকটে আপনি গূঢ়মন্ত্র, বাণ-ত্যাগ, বাণ-সংহারের কৌশল এবং ধনুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন, সেই ভগবান দ্রোণ এই পুত্ররূপে সাক্ষাৎ বিরাজ করতেছেন। ইহার পূজা ও বন্দনা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। দ্রৌপদীর এইরূপ বাক্য শুনে অন্যের কথা তো দূর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা

করলেন এবং চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ পূর্বক ভীমকে নিবারণ করলেন ও সান্ত্ব-বাক্যে অর্জুনকে বলেন, ব্রাহ্মণ অবধ্য জাতি, দ্রৌপদী ভালোই বলেছেন। তখন অর্জুন কৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝে, খড়গ দ্বারা কেশের সহিত অশ্বত্থামার শিরোমণি ছেদন করে রাখলেন এবং বন্ধন মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে শিবির হতে দূর করে দিলেন। তাহার পর পাণ্ডু-পুত্রেরা মৃত পুত্রদিগের দাহ আদি কর্ম সম্পন্ন করলেন।

এহা গেল শ্রীমদ্ভাগবতের কথা; এখন এ বিষয়ে মহাভারতে কী রয়েছে, সংক্ষেপে তাও দেখানো যাচ্ছে।

[মহাভরতের সৌপ্তিক পর্বের ৩-১৬ অধ্যায়ে] এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ব্যাসদেব যাহা রচনা করেছেন, তাহাতে দুর্যোধনের তুষ্টি-সাধন জন্য অশ্বত্থামার গুরুতর ক্রোধের কথা নাই, নিদ্রাভিভূত দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশুর শিরশ্ছেদন করে দুর্যোধনের নিকট এনে দেওয়ার বিবরণ নাই, দুর্যোধন সেইজন্য অসন্তষ্টও হন নাই, দৌপদীর রোদনে দুঃখিত অর্জুন কখনই তাঁহাকে এমন কথা বলেন নাই যে, আমি অশ্বত্থামার শিরশ্ছেদন পূর্বক তোমাকে মুণ্ড এনে দিতেছি, তুমি তার উপর আরোহণ করে স্নান ও তাহাতে মলমূত্র ত্যাগ করলে তোমার শোকের শান্তি হবে। তাহার পর অর্জুন কখনও দ্রৌপদীর শোকে বিচলিত হন নাই, অশ্বত্থামার শিরশ্ছেদন করবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন নাই, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন নাই, অস্ত্রবেগ নিবারণ করেন নাই, তাঁহাকে রজ্জুতে বাঁধেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার শিরশ্ছেদ কিংবা তাঁহাকে বধ করার জন্য অর্জুনকে অনুমতি দেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের কথা উপেক্ষা করে বন্ধনাবস্থায় অশ্বত্থামাকে পাণ্ডব শিবিরে এনে, দ্রৌপদীর হস্তে সমর্পণ, অতঃপর ছেড়ে দেওয়ার কথা নাই, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে প্রশংসা করেন নাই, খড়গ দ্বারা কেশের সহিত অশ্বত্থামার শিরোমণি কর্তন পূর্বক বন্ধন-মোচন-অন্তে তাঁহাকে বাহির করে দেওয়া হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণের অমূলক কথা নাই এবং কৃষ্ণের সাক্ষাতে পাণ্ডবদিগের অসদ্ভাব নাই।

মহাভারতে আছে, পাণ্ডবগণ অন্যায় অভিসন্ধি মূলে কতিপয় বীর, বিশেষত দ্রোণাচার্যকে নিহত করাতে ক্রোধোন্মত্ত অশ্বত্থামা কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যের নিষেধ না শুনে রাত্রিযোগে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশপূর্বক প্রথমে পিতৃঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগারে উপনীত হয়ে তাঁহাকে আক্রমণ ও সংহার করলেন। তারপর ক্রন্দন ও কোলাহল শ্রবণে বহুসংখ্যক সৈন্য ও বীরগণ জাগরিত হয়ে বর্ম-ধারণে অশ্বত্থামাকে বেষ্টন করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অশ্বত্থামাও অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের প্রাণ সংহার-পূর্বক অনতিদূরে উত্তমৌজাকে আক্রমণ ও হত্যা করলেন। তা দেখে সুধামন্যু অশ্বত্থামার হৃদয়ে গদা প্রহার করাতে, অশ্বত্থামা ধাবিত হইয়া তাঁহাকে পশুর ন্যায় বধ করলেন। সংগ্রামের কোলাহলে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র জাগরিত হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের নিধন বার্তা শ্রবণে

অশ্বত্থামাকে শর নিক্ষেপে সমাচ্ছন্ন করলেন এবং মহাবীর শিখণ্ডী ও প্রভদ্রকগণ নিশ্চিত শর দ্বারা তাঁহাকে পীড়িত করতে লাগলেন। তখন অশ্বত্থামা সিংহ-নাদ পরিত্যাগ পূর্বক সক্রোধ-লোচনে খড়গ গ্রহণ করে রথ হইতে অবতীর্ণ হয়ে সর্বাগ্রে দ্রৌপদীর পুত্রগণের প্রতি ধাবিত হলেন এবং খড়গাঘাতে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশ ছেদন করলেন। সেই সময়ে প্রবল-প্রতাপশালী সুতসোম অশ্বত্থামাকে প্রাস অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করে পুনরায় অসি উত্তোলন পূর্বক তাঁহার প্রতি ধাবিত হলেন। অশ্বত্থামা সুতসোমের সেই অসিযুক্ত বাহু ছেদন করে পুনরায় তাঁহার পার্শ্বদেশে আঘাত করলেন, তাহাতে তিনি ভিন্ন-হৃদয় হয়ে পতিত হলেন। নকুলনন্দন বীর্যবান্ শতানীক অশ্বত্থামার হৃদয়ে রথচক্র নিক্ষেপ করলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থামা শতানীককে ভূমিতলে নিপাতিত ও তাঁহার মস্তক হরণ করলেন। অনন্তর শ্রুতকর্মা পরিখ গ্রহণে দ্রোণপুত্রের অভিমুখে গমনপূর্বক তাঁহার বামভাগে তাড়না করলেন। তখন অশ্বত্থামা ক্রোধবশে খড়গ দ্বারা শ্রুতকর্মার আদ্যদেশে এমন আঘাত করলেন যে, যাহাতে তিনি বিরতানন ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে হত ও ভূমিতলে নিপতিত হলেন। ঐ সময়ে বীরবর শ্রুতকীর্তি অশ্বত্থামার সমীপস্থ হয়ে নিরন্তর শরবর্ষণ করাতে তিনি চর্ম দ্বারা তাহা নিবারণ ও শ্রুতকীর্ত্তির মস্তক ছেদন করে ফেললেন।

অতঃপর ভীষ্ম-নিহন্তা শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণের সহিত সমবেত হয়ে দ্রোণপুত্রকে বহুবিধ অস্ত্রে নিপীড়িত ও এক অস্ত্র তাঁহার ললাটদেশে নিক্ষেপ করলে, ক্রোধাক্রান্ত অশ্বত্থামা খড়গাঘাতে শিখণ্ডী, প্রভদ্রকগণ, বিরাট রাজার হতাবশিষ্ট সৈন্য সকল, দ্রুপদ রাজার পুত্র পৌত্র সুহৃৎ প্রভৃতি এবং অন্যান্য বীরগণকে ধরাতলশায়ী করলেন। তিনি এইরূপে বহুসংখ্যক মনুষ্যের প্রাণ-সংহার করে শিবির হতে বহির্গত হলেন এবং দ্বারদেশে গিয়ে কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য্যের সঙ্গে একত্রিত হলেন। তখন তাঁহারা মনে করলেন, যদি কুরুরাজ দুর্যোধন জীবিত থেকে থাকেন, তবে তাঁহাকে এই সংবাদ দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য। এই বলে তাঁহারা রণে নিপতিত দুর্যোধনের সমীপে গমন করলেন এবং কুরুরাজের প্রাণ যাওয়ার উপক্রম দেখে তাঁহাকে বললেন, আপনি স্বর্গে গিয়ে আমার পিতা আচার্যকে বলবেন, অশ্বত্থামা পিতৃ-নিহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করেছে। তিনি আরও বললেন, মহারাজ ! পাণ্ডব-পক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এই সাতজন এবং কৌরব পক্ষে আমরা তিন জন, উভয় পক্ষে এই দশজন মাত্র জীবিত আছি। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ, পাঞ্চালগণ এবং হতাবশিষ্ট মৎস্য-দেশীয়েরা সকলেই নিহত হয়েছে। রাজা দুর্যোধন অশ্বত্থামার মুখে এই শ্রুতিসুখাবহ বাক্য শ্রবণে চৈতন্য প্রাপ্ত হয়ে বললেন, হে বীর ! মহাবাহু ভীষ্ম, কর্ণ ও আপনার পিতা দ্রোণাচার্য যে কার্য সম্পন্ন করতে সমর্থ হন নাই, আপনি কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যের সহিত সমবেত

হয়ে সেই কর্ম সিদ্ধ করেছেন, নীচাশয় পাণ্ডব-সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত বিনষ্ট হয়েছে, ইহা শ্রবণ করে আমি আপনাকে ইন্দ্রের সমান জ্ঞান করি। আপনারা কল্যাণ লাভ করুন, স্বর্গে পুনরায় আপনাদিগের সহিত আমার মিলন হবে। এই কথার পর ঐ তিন বীরকে আলিঙ্গন করে দুর্যোধন কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক সুরলোকে গমন করলেন। অনন্তর তাঁহারা তিনজনে শোক-সন্তপ্তচিত্তে প্রত্যুষ সময়ে নগরাভিমুখে চলে গেলেন।

প্রভাত সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মুখে রাত্রির সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে একান্ত শোকাকুলিত ও ধরাতলে নিপতিত হলেন। তখন সাত্যকি, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব তাঁহাকে ধরে বসালে, তিনি অনেক কষ্টে চৈতন্য লাভ করে নকুলকে বললেন, তুমি শীঘ্র গিয়ে মন্দভাগিনী দ্রৌপদীকে তাঁহার মাতৃকুলের সহিত এই স্থানে আনয়ন কর। আদেশানুসারে নকুল রথারোহণে গমন করলে, রাজা যুধিষ্ঠির ভাতৃগণ সমভিব্যাহারে শিবিরে প্রবেশপূর্বক পুত্রাদির শব দর্শনে বিলাপ ও রোদন, করতে লাগলেন। সেই সময়ে নকুল দ্রৌপদী প্রভৃতিকে নিয়ে উপনীত হলে, দ্রৌপদী রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্তিনী হয়ে পুত্রশোকে ধরাতলে নিপতিতা হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্বক বলতে লাগলেন, ধর্মরাজ! অপনি পুত্রদিগকে মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত করে কি সুখে রাজত্বভোগ করবেন ? আপনি যদি ক্ষত্রিয়-ধর্মানুসারে পাপ-কর্মা অশ্বত্থামাকে বিনষ্ট না করেন, তবে আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করব। এই কথা শ্রবণে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শান্তিপূর্ণ বাক্যে তাঁহাকে নানারূপ ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় বললেন, মহারাজ ! আমি শুনেছি, দ্রোণপুত্রের মস্তকে এক স্বভাবসিদ্ধ মণি আছে, সেই পাপাত্মাকে সমরে নিহত করে সেই মণি আনয়ন করলে আমি তাহা দেখতে পাব এবং তাহা আপনার মস্তকে রেখে জীবিত থাকব, ইহাই আমার নিশ্চয় হয়েছে।

চারুদর্শনা দ্রৌপদী রাজাকে এইরূপ বাক্য বলে ভীমসেনের সম্মুখে এসে বলতে লাগলেন, নাথ ! ক্ষত্রধর্ম স্মরণ পূর্বক আমাকে পরিত্রাণ কর। তুমি পূর্বে ভ্রাতৃগণসহ আামাকে রক্ষা করেছ, কীচককে সংহার করে আমাকে মুক্ত করেছ। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন শম্বরাসুরকে সংহার করে ছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সমরে অশ্বত্থামাকে নিহত কর। এই কথা বলে দ্রৌপদী বিলাপ, করতে আরম্ভ করলেন। তা দর্শনে ভীমসেন নকুলকে সারথির কার্যে নিযুক্ত করে, রথারোহণে অশ্বত্থামার বিনাশ-বাসনায় তাঁহার রথ-চক্রের চিহ্ন অনুসরণ ক্রমে তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন।

তা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ধর্মরাজ ! আপনার ভ্রাতা বৃকোদর পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হয়ে দোণপুত্রকে সংহার করার মানসে একাকীই গমন করতেছেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা ভীমের উপর আপনার স্নেহ অত্যধিক, ইহা আমি জানি। তবে আপনি তাঁহাকে বিপদ সাগরে পতনোন্মুখ দেখে কীরূপে নিশ্চিন্ত রয়েছেন ? দ্রোণাচার্য তাঁহার পুত্রকে ব্রহ্মশির নামে যে অস্ত্র প্রদান করেছেন, সেই অস্ত্র সমুদয় পৃখিবী দগ্ধ করতে পারে। উহার সংহারে সক্ষম একমাত্র পার্থ। ইত্যাদি বহুকথা বলে, তিনি যুধিষ্টির ও অর্জুনের সহিত রথারোহণে ভীমের পেছনে গমন করলেন এবং ভাগীরথী তীরে গিয়ে সকলেই উপস্থিত হলেন। সেখানে দেখলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্যান্য ঋষিগণের সহিত উপবিষ্ট রয়েছেন এবং তাঁহার নিকটেই সেই ক্রূরকর্মা ঘৃতাক্ত কুশচীবধারী ধূলিধ্বস্ত অশ্বত্থামা আসীন আছে। ভীমসেন তাহাকে দেখা মাত্র শর সহ শরাসন গ্রহণ পূর্বক তাহার প্রতি ধাবিত হলেন এবং 'থাক্ থাক্' এই কথা বললেন। অশ্বত্থামা ভীমপরাক্রম ভীমসেন, তাঁহার ভাতৃদ্বয় এবং জনার্দনকে দেখে পুনরায় সংগ্রাম উপস্থিত হল বিবেচনায় পাণ্ডববংশ ধ্বংস জন্য ব্রহ্মশিব অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুসারে অর্জুন অশ্বত্থামার অস্ত্র সংহার হোক বলে দ্রোণাচার্য্য-প্রদত্ত দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করাতে, উভয় অস্ত্রের তেজে সসাগরা, বসুন্ধরা বিকম্পিত হতে লাগলেন। অনন্তর দেবর্ষি নারদ এবং ভারতকূলের পিতামহ ব্যাসদেব ঐ দিব্যাস্ত্রদ্বয়ের তেজঃপ্রভাবে সর্বলোক সন্তাপিত অবলোকন করে অশ্বত্থামা ও অর্জনকে বললেন, পূর্বকালে বিবিধাস্ত্রবেত্তা অনেক মহারথ ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও মানবের প্রতি এরূপ দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই। এক্ষণে আপনারা এই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করে অনুচিত কর্ম করেছেন। তখন অর্জুন কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁহাদিগকে বললেন, আমি অশ্বত্থামার অস্ত্রবেগ নিবারণার্থই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেছি। এখন ইহার প্রতিসংহার করলে, অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রভাবে আমাদিগের সকলকেই ভস্মসাৎ হতে হবে, সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে আমাদের ও লোক সকলের মঙ্গল হতে পারে, আপনারা তাহার মন্ত্রণা করুন। মহাবীর অর্জুন সত্যব্রতধর, শূর, ব্রহ্মচারী এবং গুরু-আজ্ঞানুবর্তী; এই কারণেই সেই অস্ত্র পুনরায় সংহার করলেন। কিন্তু দ্রোণনন্দন কোনক্রমেই স্বীয় দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করতে সমর্থ হলেন না। তিনি অতি দীনভাবে দ্বৈপায়নকে বললেন, হে মুনে ! আমি ভীমের ভয়ে বিপদাপন্ন হয়ে এই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেছি। পৃথিবীকে পাণ্ডব-শূন্য করাই আমার অভিপ্রেত ছিল। এক্ষণে কিন্তু আমি উহা প্রতিসংহার করতে সক্ষম হচ্ছি না। সুতরাং ক্রোধোন্মত্ততা-হেতু পাপানুষ্ঠান হইলেও উহা পাণ্ডবগণকে সংহার করবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তখন ব্যাসদেব বললেন, বৎস অর্জুন ব্রহ্মশির অস্ত্র অবগত থাকিয়াও কোনক্রমে

≈≈

তোমার বিনাশার্থ উহা ত্যাগ করেন নাই; কেবল তোমার অস্ত্র নিবারণার্থই ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। মহাবীর ধনঞ্জয় ধৈর্য্যাবলম্বী, সাধু, সর্ব-শাস্ত্রবিশারদ; তুমি কীজন্য সভ্রাতৃক তাঁহাকে বিনষ্ট করতে অভিলাষ করেছ ? তুমি সত্বর দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার কর, ক্রোধশূন্য হও, পাণ্ডবগণ নিরাপদ হোক। রাজা যুধিষ্ঠির অধর্মানুষ্ঠান-পূর্বক জয়লাভের বাসনা করেন না। এক্ষণে তোমার মস্তকস্থিত মনি পাণ্ডবদিগকে প্রদান কর; ইত্যাদি।

সেই সময়ে অশ্বত্থামা বললেন, হে মুনে ! পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে সমস্ত ধনরত্ব বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত অপেক্ষা আমার এই মণি অতিবড় শ্রেষ্ঠ। ইহ। ধারণ করলে অস্ত্রভয়, ব্যাধিভয় এবং ক্ষুধা, একবারেই তিরোহিত হয়, কোন শঙ্কাই থাকে না। অতএব কোন প্রকারেই এই মণি আমার ত্যাজ্য হতে পারে না। মণি এবং আমি উভয়েই উপস্থিত, আপনার যাহা ইচ্ছা করুন। পরন্তু এই অমোঘ ঐষিক অস্ত্র পাণ্ডব-পুত্রগণের মহিলাদিগের গর্ভস্থিত সন্তানের উপর নিপতিত হবে, আমি কোন প্রকারেই তাহার প্রতিসংহার করতে সমর্থ হব না। ব্যাসদেব বললেন, হে অনঘ ! তুমি অন্য প্রকার বুদ্ধি কারও না, গর্ভে ইহা পরিত্যাগ করে উপরত হও।

অনন্তর বাসুদেব, অশ্বত্থামা কর্তৃক গর্ভ-উদ্দেশে সেই অস্ত্র পরিত্যক্ত হলো জেনে, হৃষ্টচিত্তে দ্রোণনন্দকে বললেন, পূর্বে বিরাট নগরে এক ব্রাহ্মণ বিবাটরাজ তনয়া উত্তরাকে বলেছিলেন, কৌরব-বংশ উচ্ছিন্ন-প্রায় হলে তোমার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। কৌরব বংশের পরিক্ষণাবস্থায় ঐ পুত্রের জন্ম হবে বলে তাহার নাম পরিক্ষিৎ থাকবে। হে আচার্যকুমার ! সাধু-ব্রাহ্মণ যাহা বলে গিয়েছেন, তাহা কখনই অন্যথা হবার নহে। অতএব পরীক্ষিৎ নামে পাণ্ডবগণের বংশরক্ষাকর এক সন্তান হবে, সন্দেহ নাই।

ইহার উত্তরে অশ্বত্থামা বললেন, হে বাসুদেব ! আপনার বাক্য সফল হবে না; আমি যাহা বলেছি, তাহাই ঘটবে। আপনি বিরাট-রাজ-দুহিতার গর্ভ রক্ষার অভিলাষ করতেছেন, কিন্তু আমার অস্ত্র সত্বরেই তাহাতে নিপতিত হবে।

কৃষ্ণ বললেন, তোমার ঐ অস্ত্র অন্যথা হবার নহে সত্য বটে, কিন্তু উহাতে গর্ভস্থিত বালক নিহত ও পুনরায় জীবিত হয়ে দীর্ঘ কাঁল এই বসুন্ধরাকে অধিকার করে থাকবে। হে দ্রোণতনয়! মনীষিগণ তোমাকে পাপাত্মা কাপুরুষ বলে পরিজ্ঞাত আছেন। তুমি বালক নিহন্তা, অতএব নিশ্চয়ই এইক্ষণেই এই পাপ কর্মের ফলভোগ করবে।

তোমাকে সহায়-বিহীন হয়ে তিন সহস্র বৎসর মৌনভাবে নির্জন প্রদেশে পরিভ্রমণ করতে হবে; কোনক্রমেই লোকালয়ে অবস্থিত হতে পারবে না। তুমি পুয়শোণিত-গন্ধ এবং সমস্ত ব্যাধি-সমন্বিত হয়ে দুর্গম অরণ্য আশ্রয় করত বিচরণ করবে। আর পরীক্ষিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বেদাধ্যয়ন ও কৃপাচার্যের নিকট সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করে ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যষ্টিবৎসর কাল এই ভূমণ্ডল পালন করবেন। তুমি এইক্ষণে তাঁহাকে অস্ত্রবলে দক্ষ করলেও আমি তাঁহাকে পুনর্জীবিত করব।

সেই সময়ে ব্যাসদেবও বললেন, হে আচার্যকুমার ! তুমি যখন আমাদিগের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শনপূর্বক এই নিদারুণ কার্যের অনুষ্ঠান করলে এবং ব্রাহ্মণ হয়েও যখন ক্ষত্রিয়ধর্ম অবলম্বনে কুকার্যে প্রবৃত্ত হলে, তখন হৃষীকেশ যাহা বলতেছেন, তাহাই ঘটবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অশ্বত্থামা উত্তরে বললেন, তপোধনা আমি এই জীবলোকে আপনারই সহিত অবস্থিতি করব। আপনি এবং বাসুদেব সত্যবাদী হোন। তিনি এই কথা বলে পাণ্ডবগণকে সেই মণি প্রদান পূর্বক বিষন্ন মনে অরণ্যে গমন করলেন। পাণ্ডবগণ মণি গ্রহণ করেই শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বাসুদেবের সহিত অবিলম্বে রথারোহণে দ্রৌপদীর সন্নিধানে প্রস্থান করলেন। তাঁহারা কিয়ৎকাল মধ্যে শিবিরে পৌঁছে শোকসন্তপ্তা দ্রৌপদীর সমীপে উপনীত হলেন এবং তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনি বলে, ভীমসেন অশ্বত্থামার শিরোমণি তাঁহার হস্তে প্রদান করলেন। দ্রৌপদী মণি গ্রহণ করে বললেন, অশ্বত্থামা আমাদিগের গুরুপুত্র। তিনি যে মণি মস্তকে ধারণ করতেন, এক্ষণে ধর্মরাজ সেই মণি স্বীয় মস্তকে ধারণ করুন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর অনুরোধে গুরুর উচ্ছিষ্ট বলে মস্তকে মণি ধারণ করলেন এবং তাহাতে অপূর্ব শোভা পেতে লাগলেন। তা দেখে পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী সত্বরে গাত্রোত্থান করলেন, ইত্যাদি।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ও শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে কত প্রভেদ !! অথবা উহা একবারেই বিপরীত সম্পর্কে সম্পর্কিত কি না ? মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রীয়, ধার্মিক; তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকলই জানতেন এবং তদানুসারে পাণ্ডবদিগকে পরিচালিত, করতেন। পাণ্ডবেরাও কৃষ্ণগত-প্রাণ-কৃষ্ণার্জুনের এক আত্মা। কৃষ্ণ যাহা বলতেন, পাণ্ডবগণ অবনত শিরে তাহা সম্পন্ন করতেন। যেখানে ধর্ম, সেইখানেই কৃষ্ণ। পাণ্ডবেরা ধার্মিক বলেই ভগবানন সখারূপে সতত তাঁহাদের সন্নিহিত রয়েছেন। অর্জুন ঘোরতর আপদ-বিপদে নিপতিত হলেও কখনো তাহাতে বিচলিত হন নাই এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে উপেক্ষা করেন নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতকার কৃষ্ণার্জুনের সেই সকল পবিত্র

সদ্‌গুণগুলি বাজেয়াপ্ত করে লিখেছেন, অর্জুন যখন অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ করলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বললেন, এই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদ কর। আমি জানি, ইহা করতে, তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ। এই অধম ব্রাহ্মণকে বধ করলে কোন পাপ নাই। আবার দ্রৌপদী যখন বললেন, অশ্বত্থামা গুরু-পুত্র, শীঘ্র ইহাকে ছেড়ে দাও। কৃষ্ণ তখনও বলে উঠলেন, দ্রৌপদী ভালোই বলেছেন, অশ্বত্থামা কদাপি বধযোগ্য হতে পারে না। ইহাকে বধ করলে মহাপাপ জন্মিবে। তারপর মহাভারতে যে অর্জুন অবিচলিত চিত্ত, সত্যধর্ম-পরায়ণ, স্থির-প্রতিজ্ঞ এবং কৃষ্ণগত-প্রাণ, শ্রীমদ্ভাগবত লেখক সেই সর্ব গুণসম্পন্ন অর্জুন দ্বারা দ্রৌপদীর শোক-শান্তির জন্য গুরু-পুত্র অশ্বত্থামার শিরশ্চেদ, তদুপরি তাঁহার স্নান ও মল-মূত্রত্যাগের ব্যবস্থা করিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে উপেক্ষা দেখিয়েছেন, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গুরুপুত্রের কেশের সহিত শিরোমণি কর্তন করেছেন এবং তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের পাপে পাপী বানিয়েছেন।

মহাভারতে ব্যাসদেব যে কৃষ্ণার্জুনকে বিবিধ গুণরত্নে ভূষিত করেছেন, যাঁহাদিগের একাত্মতা-বর্ণনায় নরনারায়ণ বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন, যে কৃষ্ণের উপদেশের জন্য পাণ্ডবগণকে লালায়িত হয়ে আদেশ পালন করতে দেখিয়েছেন এবং যে অর্জুনকে ব্রত পরায়ণ, সত্যধর্ম-নিরত ও গুরুশুশ্রূষা-তৎপর বলে লিখে গিয়েছেন, সেই ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে সেই কৃষ্ণার্জুনের বিবিধ গুণরত্ব কেড়ে নিয়ে তাঁহাদিগকে পাপপঙ্কে ডুবিয়ে দিয়ে কৃষ্ণার্জুনের একাত্মতা ছিন্ন করে ফেলেছেন এবং পাণ্ডবদিগকে স্বেচ্ছাচারী বানিয়েছেন, একথা কিছুতে সম্ভবপর নহে। ইহাই কি প্রভুর নির্মূল যশ, না কৃষ্ণার্জুনের অপরিসীম কুৎসা ? কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতে যেরূপ যাহা ধর্ণনা করেছেন, শ্রীমদ্ভাগবত লিখতে কি তাহা ভুলে গিয়াছিলেন ? যে ব্যাসদেব গঙ্গাতীরে বসে স্বয়ং মধ্যবর্তী হয়ে শান্তিস্থাপন জন্য অশ্বত্থামার মস্তকস্থিত মণি, তাঁহারই দ্বারা পাণ্ডবদিগকে প্রদান করেছেন, সেই মহাত্মা স্বকৃত কর্ম ও স্বকৃত রচনা উল্টিয়ে দিয়ে, মহাভারতের বিপর্যয়ে শ্রীমদ্ভাগবত লিখেছেন ও মহাভারতরূপ স্বকীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ ধ্বংস করেছেন, ইহাও কি হতে পারে ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

★★ এখানে ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে যা বর্ণন করা রয়েছে তা যদি মহর্ষি ব্যাসকৃত রচনা হয়ে থাকে তবে মহাভারতেও একই বর্ণন থাকা উচিত। সৌপ্তিকপর্বের অন্তর্গত অষ্টম থেকে ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনা অনেক মতভেদ এবং পার্থক্য রয়েছে। তাই এটা বলা যায় যে, মহর্ষি ব্যাসদেবের মতো বিচক্ষণ একজন ব্যক্তি কখনোই এইরূপ স্ববিরোধ মূলক গ্রন্থ রচনা করতে পারে না।

— ☆ —
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে নবম অধ্যায় —
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তি

এই গ্রন্থে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তি, ভীষ্মদেবের প্রাণত্যাগ এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-গমন যেরূপে কীর্তিত হয়েছে, মহাভারতে কিন্তু সেইরূপ লিখিত হয় নাই। সেই সম্পর্কে ৩-৪টি কথা দেখানো হচ্ছে।

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যগ্রহণের পর বাসুদেব ও অর্জুন পরম পরিতুষ্ট হয়ে কিয়ৎকাল পরিভ্রমণ-অন্তে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে উপনীত হলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে, অর্জুন তাঁহাকে বললেন, মহাত্মন ! আপনি রণস্থলে যে সকল যোগ-ধর্ম বলেছিলেন, তাহাও শুনেছি এবং আপনার বিশ্বমূর্তিও দেখেছি। কিন্তু যা শুনেছি, তাহা আমার স্মরণ হচ্ছে না। অতএব পুনরপি যোগ-ধর্ম কীর্তন করে আমাকে চরিতার্থ করুন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ধর্মতত্ত্ব কীর্তনে অর্জুনকে কৃতার্থ করলেন। তা উত্তর-গীতা (অনুগীতা) বলে কথিত হয়েছে।

সেই দিবসই তাঁহারা হস্তিনায় উপস্থিত হয়ে, বাসুদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্বারকা-গমনের অভিপ্রায় জানালেন। তখন অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্বে পুনরায় আসতে অনুরোধ করে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বিদায় দিলেন, তিনিও অর্জুনের সঙ্গে একত্র-বাসে সেই রাত্রি অতিবাহিত করে পর-দিবস যুধিষ্ঠির ও পিসি কুন্তীর অনুমতি অনুসারে সুভদ্রাকে রথে আরোহণ করিয়ে হস্তিনাপুর হতে বিনির্গত হলেন। কপিধ্বজ, সাত্যকি, মাদ্রবতীসুত নকুল, সহদেব, আগধ-বুদ্ধি বিদুর এবং বিক্রম ভীম তাঁহার অনুগমন করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভীমাদি ও বিদুরকে নিবর্তিত করে দারুক ও সাত্যকিকে সত্বর অশ্বচালন করতে আদেশ দিলেন।

ইহাতে স্পষ্টই লক্ষিত হচ্ছে যে, মহাভারতের লেখানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-প্রাপ্তির পর শ্রীকৃষ্ণ একদিনমাত্র হস্তিনায় অবস্থান করেছিলেন, দ্বারকায় যাওয়ার কালে তিনি সুভদ্রা, সাত্যকি, দারুককে সঙ্গে নিয়াছিলেন এবং ভীম, নকুল, সহদেব, বিদুরও কতকদূর পর্যন্ত তাঁহার অনুগামী হয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কিন্তু অন্যরূপ। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থানের কাল চারি মাস; এই প্রসঙ্গে বিদুরের তো নামগন্ধই নাই, তাহার পর সুভদ্রাকে সঙ্গে নেওয়ারও কোন কথা নাই কেবল লিখিত আছে, উদ্ধব ও সাত্যকি

≈≈

-কে সঙ্গে নেওয়ার কথা। এর প্রমাণ ***[ভাগবত প্রথম স্কন্ধ, ৯ অধ্যায়, শ্লোক ৩৩]***

মহাভারতে ভীষ্মদেবের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যায় শয়ান থেকে রাজা যুধিষ্ঠিরকে অশেষ ধর্ম উপদেশ প্রদানপূর্বক, যখন প্রাণত্যাগ করবার অভিলাষে যোগাবলম্বন করলেন, তখনই তাঁহার গাত্র-বিদ্ধ অস্ত্র সকল খসে পড়ল, মস্তক হতে মহোল্কার ন্যায় কোন পদার্থ নিঃসৃত হয়ে আকাশে প্রবেশ করে ক্ষণকাল মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতকার লিখেছেন, গাত্র-বিদ্ধ অস্ত্রের পীড়নে ভীষ্মদেবের মৃত্যু ঘটেছে, ইত্যাদি। ***[ভাগবত প্রথম স্কন্ধ, নবম অধ্যায়]***

উভয় গ্রন্থের এত বৈষম্য পাঠ করেও কি কোন পাঠকের বলতে প্রবৃত্তি হবে যে, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত, একই লেখকের লেখা ?

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায় —

অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রনিক্ষেপ

দ্বারকা যাওয়ার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব ও সাত্যকিকে সঙ্গে নিয়ে রথারূঢ় হয়েছেন, এমন সময়ে অশ্বত্থামারর ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরার সম্মুখীন হচ্ছে দেখে, উত্তরা প্রাণভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও চিৎকার পূর্বক হে জগন্নাথ ! রক্ষা কর, রক্ষা কর, বলিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হলেন। তখন ভগবান বিপদ দর্শনে বিরাট-তনয়ার গর্ভস্থিত সন্তান রক্ষার নিমিত্ত অতি সুক্ষ্মরূপে তাঁহার গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং গর্ভস্থ শিশুকে আবৃত করে নিলেন। তখন ব্রহ্মাস্ত্র ঐ গর্ভে প্রবেশ-অন্তে ভগবানের শরীরে ঠেকিয়া প্রতিহত হলো। ***[অষ্টম অধ্যায়ে ১-১৫ শ্লোক ভাবার্থ]***

পূর্বে পাণ্ডুপুত্রদিগের বিনাশ জন্য অশ্বত্থামা যখন ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করেছিলেন, শ্রীমদ্ভাবতকার কিন্তু তখন বাসুদেবের চক্র দ্বারা সেই অস্ত্র সংহার-পূর্বক তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়েছেন। এক্ষণে পুনরায় তাহারই প্রয়োগে ভগবান দ্বারা চক্রের পরিচালনা না করে, স্বয়ং তাঁহাকে গর্ভস্থ শিশুরক্ষার্থ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করালেন। যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় জগতে না হইতে পারে এমন কর্ম নাই, একটা অস্ত্র দমন জন্য সেই ইচ্ছাময় ভাগিনেয়-বধূ উত্তরার গর্ভে স্বয়ং প্রবেশ করলেন। ইহা অস্বাভাবিকের মত বোধ হয় না কি ? ইহাতে ভগবানের অযশ বই যশই বা কোথায় থাকে ?

মহাভারতে এই অস্বাভাবিক কথার সম্পর্কও নাই। তাহাতে আছে, রাজা পরিক্ষিৎ গর্ভ মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা পীড়িত হওয়ায় নিশ্চেষ্ট শবাকারে ভূমিষ্ঠ হলে তা দেখে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা এবং বান্ধবদিগের অন্যান্য যোষিৎ সকল রোদন ও অশেষ প্রকারে ভগবান বাসুদেবের স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন।

পরে সেই পুরুষ-প্রবর কৃষ্ণ উত্তরার বিপুল বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করে সলিল স্পর্শন পূর্বক ব্রহ্মাস্ত্র প্রতিসংহার করতে লাগলেন। বিশুদ্ধাত্মা অচ্যুত দাশার্হ কৃষ্ণ বালকের জীবনদানে প্রতিজ্ঞা করে অখিল ভূমণ্ডলকে শ্রবণ করিয়ে বললেন যে, উত্তরে ! আমি মিথ্যা বলি নাই, আমি যাহা বলেছি, তাহা সত্য হবে; এই দেখ, সকলের সমক্ষেই আমি এই বালককে জীবিত করি। পূর্বে যখন কোনরূপে মৎকর্তৃক অণুমাত্রও মিথ্যা উক্ত হয় নাই এবং আমি যুদ্ধ হতে পরমুখ হই নাই, তখন সেই পুণ্যবলেই এই বালক জীবিত হোক। যেমন ধর্ম ও ব্রাহ্মণগণ আমার প্রির, অভিমন্যুর পুত্রও তদ্রূপ প্রিয়; অতএব এই মৃতজাত পুত্র জীবিত হোক। যখন আমি বিজয় অর্জুনের সহিত কখন বিরোধ করি নাই, তখন সেই সত্য অনুসারে এই মৃতশিশু জীবিত হোক। যখন সত্য এবং ধর্ম আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন, তখন অভিমন্যুজাত এই মৃত-শিশু জীবিত হোক। কংস ও কেশী যে ধর্মতঃ মৎকর্তৃক নিহত হয়েছে, সেই সত্যধর্ম অনুসারে জন্য এই মৃত-বালক জীবিত হোক। বাসুদেব কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে সেই বালক ক্রমে ক্রমে সচেতন হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল সঞ্চালন করতে লাগল।
একই প্রস্তাব উভয় গ্রন্থে এইরূপ বিভিন্ন আকারে লিখিত দেখিয়াও কি বলিতে ইচ্ছা হয় যে, মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত একই কলমে আঁকা ?

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে —

পরিক্ষিৎ রাজার জন্মবিবরণ

শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যাভিষিক্ত করে তাঁর দ্বারা তিনটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করালেন। অতপর তিনি সাত্যকি ও উদ্ধব সমষ্টিব্যাহারে দ্বারকায় চললেন, এমন সময়ে যেদিন শুভলগ্ন উপস্থিত হলো, সেইদিন সেই শুভলগ্নে উত্তরার গর্ভ হতে দ্বিতীয় পাণ্ডুর ন্যায় রাজা পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হলেন। রাজা সুধিষ্ঠির ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও বালকের জাতকর্মাদি করিয়ে তাঁহাদিগকে সুবর্ণ, গো গ্রাম, হস্তী এবং নানাধিধ খাদ্য-সামগ্রী দান করলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রচুর পরিমাণে দান লাভে পরিতুষ্ট হয়ে বললেন, হে রাজন ! এই বালককে বিষ্ণু রক্ষা করেছেন, অতএব এর নাম বিষ্ণুরাত অর্থাৎ বিষ্ণুদত্ত হলো।

মহাভারতে কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত রয়েছে। অশ্বমেধ পর্বে আছে, মহাত্মা বাসুদেব ও ব্যাসদেব বহু প্রকার উপদেশ প্রদানে যুধিষ্ঠিকে রাজ্যভার গ্রহণ করালে, ব্যাসদেব তাঁকে একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে আদেশ করেন। তাহাতে রাজা যুধিষ্ঠির উত্তর দেন যে, ভাণ্ডারে ধনরত্ব কিছুই নাই নাই, দুর্মতি দুর্য্যোধন সমস্ত নষ্ট করেছে। সুতরাং অর্থ ভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন হবে কীরূপে ? তখন মহর্ষি মরুত রাজার যজ্ঞের কাহিনি বলে, চিমালয়-পর্বতস্থিত সেই যজ্ঞের অসংখ্য সুবর্ণ আনয়ন পূর্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে তাঁহারা রথ, অশ্ব, হস্তী-উষ্ট্র ও বাহক প্রভৃতি নিয়ে ঐ অগণিত স্বর্ণ আনতে হিমালয়ে গমন করেন।

[মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব, তৃতীয়-চতুর্থ অধ্যায়]

পরিক্ষিতের জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে, রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ স্মরণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে দ্বারকা হতে হস্তিনাপুরে এসে উপস্থিত হন, সেই সময়ে শবরূপে পরীক্ষিত ভূমিষ্ঠ হওয়ায় কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং উত্তরার রোদনে অনুরোধে, স্তবনে ভগবান কৃপাপূর্বক ঐ মৃত বালকের প্রাণদান করেন। ভরত-কুল ক্ষীণপ্রায় অবস্থায় অভিমন্যু-সুত উৎপন্ন হওয়াতে তিনিই তাঁর নাম রাখেন পরিক্ষিৎ। তৎকালে যুধিষ্ঠিরাদি কেউ বাড়িতে ছিলেন না; তাঁরা ধৌম্য পুরোহিত-সহ হিমালয়ে গিয়েছিলেন এবং পরিক্ষিৎ এক মাস বয়স্ক হলে, বাটীতে প্রত্যাগমন করেছিলেন। স্বস্তিবাচন আদি জাত বালকের যা কিছু কর্ম, গোবিন্দের আদেশে ভরতকুলাঙ্গনাগণ ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহা সমস্তই করিয়ে ছিলেন। সুতরাং উত্তরার গর্ভ হতে আর একটি বালক দৈবকীর গর্ভ হতে আর একটা কৃষ্ণ এবং কুন্তী দেবীর গর্ভ হতে আর একটা যুধিষ্ঠির না জন্মিলে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা পোষায় কৈ ? রক্ষা পায় কীসে ?

এক ব্যাসদেব যদি মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত, এই দুই গ্রন্থই লিপিবদ্ধ করবেন, তাহা হলে তিনি এক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে অতি অল্প-সময় মধ্যে যুধিষ্ঠির দ্বারা তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়ে, যুধিষ্ঠির বাটীতে থাকতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় যাওয়ার প্রাক্কালে পরিক্ষিৎকে জন্ম গ্রহণ করিয়ে ও ধৌম্য ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহার নাম রেখে, আবার আর এক গ্রন্থে স্বীয় আদেশে যুধিষ্ঠির দ্বারা একটামাত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করালেন কেন ? পরীক্ষিতের জন্ম সময়ে যুধিষ্ঠিরদিগকে হিমালয়ে রাখিলেন কেন ? সেই সময়ে যজ্ঞ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনায় আনলেন কেন এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা পরিক্ষিৎ নাম রাখিলেন কেন ? এসবের পরেও কি আর তাঁকে সত্যবাদী বলতে সাহস হয় ? এই সকল অকট্য কারণেই বলতে হয়, শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাস কৃত নয়, তা তাঁহার নামে কৃত্রিম।

— ☆ —

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধ দ্বিসপ্ততিতম (৭২) অধ্যায়ে —
জরাসন্ধ বধ

শুকদেব বললেন, একদা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, কুটম্ব, বান্ধব প্রভৃতির সমক্ষে স্তব-বিস্তারপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা আমি তোমার পবিত্র বিভূতি সকলের অর্চনা করতে মনস্থ করতেছি। এইরূপ বলে তিনি আবার স্তব করলেন। তৎপরে ভগবান বললেন, হে রাজন ! হে শত্রুকর্ষণ ! আপনি যাহা সঙ্কল্প করছেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট। আপনার এই মঙ্গলদায়িনী কীর্তি সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত হবে। প্রভো ! এই মহাযজ্ঞ ঋষিগণের, পিতৃগণের, দেবগণের, বন্ধুগণের এবং আমাদিগেরও অভীপ্সিত। আপনি সমুদয় নৃপতিকে জয় ও পৃথিবী বশীভূত করে যাবতীয় সম্ভাব সুসম্পন্ন করে উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। আপনার ভ্রাতা সকল লোকপালদিগের অংশে জন্মিয়েছেন এবং ভক্তি দ্বারা আমাকেও বশীভূত করেছেন। মভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি জগতে অজেয়; মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও তাহাদিগকে পরাস্ত করতে পারেন না। ভগবানের কথা শ্রবণ করে যুধিষ্ঠিরের মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল, তিনি ভ্রাতৃগণকে দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত করলেন। সহদেব দক্ষিণদিকে, অর্জুন উত্তরদিকে, ভীম পূর্বদিকে এবং নকুল পশ্চিমদিকে প্রেরিত হলেন। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়ে, তাঁহারা বলে জন্মাসন্ধ ভিন্ন সমস্ত রাজাদিগকে পরাজিত করলেন ও প্রচুর পরিমাণে ধনরত্ন আনলেন। একমাত্র রাজা জরাসন্ধ ব্যতীত, আর সকলেই পরাস্ত হয়েছেন শুনে, রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত চিন্তিত হলেন, আদি-পুরুষ হরি, উদ্ধবের কথিত উপায় প্রস্তাব করলেন এবং ভীমসেন, অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ এই তিনজনে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে জরাসন্ধের রাজধানীতে উপনীত হলেন। আতিথ্য-বেলায় উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণ-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের নিকট বলতে লাগলেন, আমরা বহুদূর হতে এসেছি। ব্রাহ্মণ যাহা যাহা যাচনা করে, তাহা দান করা উচিত। আপনার মঙ্গল হউক, আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। তখন জরাসন্ধ চিন্তা করতে লাগলেন এবং লক্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলে নিশ্চয় করলেন। তথাপি তিনি বললেন, হে বিপ্রগণ ! আপনাদের প্রার্থনা কী, তাহা প্রকাশ করুন। এমন কি, আমার মস্তক প্রার্থনা করলে, আমি তাহাও আপনাদিগকে, দান করব। ইহার পর ভগবান বললেন, আমরা ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ প্রার্থনা করে এ স্থানে উপস্থিত হয়েছি। ইনি কুন্তীর পুত্র ভীম, ইনি তাঁহার ভ্রাতা, আমাকে ইহাদিগের মাতুল-পুত্র কৃষ্ণ, আপনাদিগের শত্রু বলে জানবেন। ইহার পর জরাসন্ধ বললেন, তুমি ভীরু, আমার ভয়ে সমুদ্রের শরণ নিয়েছ; অর্জুন বালক,

সুতরাং যুদ্ধের অযোগ্য। অতএব ভীমই মাত্র যুদ্ধ করবার যোগ্যপাত্র, তাঁহার সঙ্গেই আমার যুক্ত হবে। এই কথা বলে তিনি ভীমসেনকে একটি মহতী গদা দান করলেন, নিজেও একটা গদা নিলেন। অতঃপর উভয়ে গদাযুদ্ধ আরম্ভ হলে উভয়ে উভয়কে গদা দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। তাহাতে পরস্পরের বাহু, জঙ্ঘা ও স্কন্ধদেশে আঘাত লাগাতে ঐ গদা চূর্ণ হয়ে গেল। অনন্তর মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হলো। শ্রীকৃষ্ণ জরা নামক রাক্ষসীর কথা মনে করিয়ে ভীমকে একটা শাখা বিদারণ করে দেখালেন। তা দেখে ভীম জরাসন্ধের দুই পায়ে ধরে তাঁহাকে ভূমিতলে নিপতিত করলেন এবং পদ দ্বারা তাঁহার এক পা চেপে রেখে, অপর পা উর্দ্ধে উঠিয়ে জরাসন্ধকে দুইভাগ করে ফেললেন।

এইরূপে জরাসন্ধ নিহত হলে, অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে আলিঙ্গন করে তাঁহার পূজা করলেন। তৎপরে বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত করাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন। জরাসন্ধের পুত্র কৃষ্ণের আদেশে তাঁহাদিগকে মুক্ত করালে, তাঁহারা পুনরপি কৃষ্ণের স্তব করলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তিত হলেন। তাহার পর ভগবান জরাসন্ধের পুত্রকে সিংহাসন আরূঢ় করে ভীমার্জুন সহ ইন্দ্রপ্রস্থে এসে যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বিবরণ বললেন।

গদায় গদায় আঘাত লাগাতে যে গদা চূর্ণ হলো না, সেই গদা-দুইটা কিন্তু ভীম ও জরাসন্ধের শরীরে লাগিয়া চূর্ণ হয়ে গেল, ইহা বড়ই বিচিত্র কথা ! তাহার পর মহাভারতে ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের গদা-যুদ্ধের কাহিনি আদৌ লিখিতই নাই। ***[প্রমাণঃ মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ২৩]*** অস্ত্র-যুদ্ধে জরাসন্ধ অজেয় ছিলেন বলেই, শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ নীতি-কৌশলে জরাসন্ধকে ভীমের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়ে ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণের সেই নীতি-কৌশল বাজেয়াপ্তপূর্বক গদা-যুদ্ধের প্রবর্তক বানিয়েছেন জরাসন্ধকে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের যশ কেড়ে নেওয়া হলো কি না ? ব্যাসদেবের মহাভারতে ও হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কর্মের চালক, অধর্মের বিনাশক এবং ধর্মের প্রবর্তক। তিনি অদ্বিতীয় নীতিজ্ঞ, ইতিহাসাদি নানাবিষয়ে সুপণ্ডিত, সর্বজ্ঞ, ধার্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার বাক্য কখনই বিফল হতো না, ভ্রমেও তিনি মিথ্যা কথা বলতেন না, নীতি অনুসারেই সকলকে সুপরামর্শ দিতেন। শ্রীকৃষ্ণই জগতের চালক, তাঁহার কিন্তু কেহই চালক ছিল না। যিনি বিশ্ব-আত্মা, বিশ্ব-মূর্ত্তি, তাঁহাকে চালিত করতে পারে, এমন শক্তি কার ? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের চালক হইয়াছেন উদ্ধব। শ্রীকৃষ্ণ সুপরামর্শ, দানে অপটু ও অক্ষম ছিলেন, তাই যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসায়, সেই মুহূর্তেই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে বলেছিলেন;

যুধিষ্ঠিরও তখনই ভ্রাতাদিগকে দিগ্বিজয়ে পাঠালেন। তাঁহারা কিন্তু শুভে শুভে ফিরতে পারলেন না; রাজা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করে দিলেন। জরাসন্ধের হাতে পরাজিত হয়ে অপ্রতিভ ও অপদস্থ হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের পাকা-উপদেশ স্মরণ করলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বলে ভীমার্জুন সমভিব্যাহারে জরাসন্ধ-বধে প্রস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে অমনতী, নির্বোধ, অদূরদর্শী ছিলেন, তিনি উদ্ধবের চালটা মনে করে উদ্ধার পাইলেন, উদ্ভবই যে শ্রীকৃষ্ণের চালক ছিলেন, যুধিষ্ঠির কি তাহা জানতেন না ? তিনি যদি ঐ যজ্ঞের পরামর্শটা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করে, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করতেন, তাহা হইলে তাহারা কখনই জরাসন্ধের হাতে অপমানিত হতেন না ! শ্রীকৃষ্ণের কথায় ভীমার্জুন অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই সঙ্গে নিলেন না; শুধু হাতে ব্রাহ্মণবেশে কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের নিকট গমন করলেন। জরাসন্ধ ভীমের খালী-হাত দেখে একটা পুরাতন গদা তাঁহাকে দিলেন, সেই গদাটা আবার জরাসন্ধের গায় ঠেকিয়াই চূর্ণ হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের হাল্কা কথায় ভীম তাঁহার দুর্জয় গল্প না নিয়ে, কি অপরিসীম অনুতাপেই পড়লেন ! তখন যুদ্ধ করবেন, না পরিতাপ করিবেন, এই চিন্তায় ভীমের মাথাটা ঘুরে গেল। ভীম যদি তাঁহার দুর্জয় গদাটি সঙ্গে লিয়ে যেতেন, তবে বোধ হয় জরাসন্ধ-বধে তাহাকে তাত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। ভীমাদি ব্রাহ্মণবেশে জরাসন্ধের নিকটে গেলেন কেন ? ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ইহাই বুঝা যায় যে, যুদ্ধের কথা অপ্রকাশ রেখে ব্রাহ্মণবেশে প্রার্থনা না করলে, জরাসন্ধ কখনই যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হতেন না।

যুধিষ্ঠিরের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার ভক্ত অজেয়" তবে জরাসন্ধ দিগ্বিজয়ে নির্গত যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতাদিগকে পরাস্ত করলেন কীরূপে ? ইহাতে কার্য দ্বারা কিন্তু গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণকে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন করেছেন। জরাসন্ধ-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ ভীমের পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুর্বল ছিলেন কি না, তাই প্রবল শত্রু জরাসন্ধের বিনাশক ভীমকে একটা পূজা দেওয়া তাঁহার অবশ্য কর্তব্য হয়েছিল ! জরাসন্ধের জন্য দায়-ঠেকা যুধিষ্ঠির; শ্রীকৃষ্ণের এ পূজাটা সেই যুধিষ্ঠির দ্বারা দেওয়ালেই ভাল হতো ! ভীমসেন যে জরাসন্ধকে বধ করেছিলেন, তাহা কার নৈতিক চালে ? সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে পূজা দেওয়া কি ভীমের কর্তব্য ছিল না ? শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবেশে জরাসন্ধের নিকটে উপস্থিত হয়ে বলিয়াছিলেন, হে রাজন! তোমার মঙ্গল হউক। -অতঃপর জরাসন্ধ-বধ হওয়ায় কৃষ্ণের আশীর্বাদ-বাক্য মিথ্যা হলো; সুতরাং এখানে গ্রন্থকার কার্যত শ্রীকৃষ্ণকে আবারও মিথ্যাবাদী বানালেন। তবে কি শ্রীকৃষ্ণস্তাবকতায় সন্তুষ্ট হতেন যে, সমস্ত গ্রন্থে এক প্রকার স্তব লিখে তাঁহার নির্মল যশ শ্রীমদ্ভাগবতকার কীর্তন করলেন ? তারপর কতকগুলি রাজাকে জরাসন্ধ কী কারণে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন, গ্রন্থকার আদৌতে তাহা প্রকাশ করেন নাই।

জরাসন্ধের নিকট শ্রীকৃষ্ণ নিজ নামে, অথবা বসুদেবের পুত্র বলে পরিচয় না দিয়ে, পরিচয় দিলেন ভীমের মাতুল-ভ্রাতা বলে। ওদিকে আবার পাণ্ডু-রাজার পুত্র বলে ভীমার্জুনের পরিচয় না দিয়ে, তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া হলো মাতৃনাম বলে। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয়, জরাসন্ধ ভীমার্জুনের মাকেই চিনিতেন, পাণ্ডুরাজা এবং শ্রীকৃষ্ণকে তিনি কোনো কালেও জানতেন না। অথচ গ্রন্থকার এই শ্রীমদ্ভাগবতেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে জরাসন্ধের অষ্টাদশ বার যুদ্ধের কাহিনি লিখেছেন। তবে ভীমদিগের মাতুল-ভ্রাতাকেই জরাসন্ধ জানতেন, শ্রীকৃষ্ণকে কখনও জানেন নাই, ইহার তাৎপর্য্য কী ?

ব্যাসদেবের মহাভরতে, যুধিষ্ঠিরের সভা প্রবেশকালে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে ছিলেন না; তিনি ছিলেন দ্বারকাতে। জরাসন্ধকে বধ করার পূর্বে যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ কখনই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হননি। তাঁহারা দিগ্বিজয় করেছিলেন জরাসন্ধের বিনাশের পরে। ***[প্রমাণঃ মহাভারতের, সভাপর্বের ২৩ অধ্যায়ে জরাসন্ধের বধ হয় এবং ২৫ অধ্যায়ে দিগ্বিজয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে]*** মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ কোন কালেও যুধিষ্ঠিরকে প্রভু সম্বোধন করেন নাই। মহাভারতে এবং হরিবংশে তিনি কখনও কোন রাজা কিংবা আত্মীয়ের নিকট স্তাবকতা কি ভীরুতা অবলম্বনে কথা বলেন নাই ? প্রকৃত প্রস্তাবে মহাভারত ও হরিবংশের নিতান্ত বিপর্যয়ে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচিত।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ কেমন নীতিজ্ঞ, কেমন অগাধ-বুদ্ধিসম্পন্ন, কেমন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তাহা দেখুন।

মহাভারতের সভাপর্বে, ময়দানব কর্তৃক সভা নির্মিত হলে, রাজা যুধিষ্ঠির সেই সভায় প্রবেশ করলেন। তখন মহর্ষি-দেবর্ষিগণও সেখানে উপস্থিত হয়ে সভার অপূর্ব শোভা দর্শনে রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে বললেন। তদনুসারে তিনি মন্ত্রী ও ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁহারাও তাঁহাকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে অভিপ্রায় দিলেন। তৎপরে ধৌম্য পুরোহিত এবং পুনরপি ভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বললেন, মহারাজ ! কেন চিন্তা করেন ? আপনার অভিপ্রেত যজ্ঞ অবশ্য সুসম্পন্ন হবে। ইহাতেও যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ ঘুচিল না, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আনতে দূত পাঠালেন। দ্বারকা হতে শ্রীকৃষ্ণ এসে উপস্থিত হওয়াতে, যুধিষ্ঠির তাঁহাকেও রাজসূয় যজ্ঞের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অনভিজ্ঞ বা অদূরদর্শী ছিলেন না এবং অদূরদর্শীর ন্যায় কাউকে পরামর্শও দিতেন না। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারি কি না, জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীকৃষ্ণ মূর্খের

মত 'হ্যাঁ, পারেন' বলে উত্তর করেন নাই যে, যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের নিকটে প্রতিহত হয়ে তাঁহার বাক্য ব্যর্থ বোধ করবেন। শ্রীকৃষ্ণ নীতি-বিশারদ সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে মহারাজ ! আপনি সর্বগুণালঙ্কৃত সম্রাটের উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু জরাসন্ধ বাহুবলে সমস্ত রাজাকে পরাজিত করে পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছেন। শিশুপাল, বক্রদন্ত, ভগদত্ত প্রভৃতি বড় বড় রাজারা কর-স্বরূপে বহুমূল্য রত্নাদি প্রদান করে জরাসন্ধের উপাসনা করতেছে। তাঁহার ভয়ে কতকগুলি রাজা স্বরাজ্য পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করেছেন এবং মৃগরাজ যেমন অবলীলাক্রমে হস্তিগণকে আক্রমণ করে গিরিগুহায় বন্ধ রাখে, তিনিও সেইরূপ কতকগুলি রাজাকে ধরে এনে দুর্গমধ্যে বন্ধ করে রেখেছেন। তাঁহাদের সংখ্যা একশত পূর্ণ হলেই মহাদেবের পূজাতে বলি-প্রদান করবেন; এখন বাকিমাত্র চৌদ্দটা। জরাসন্ধ বর্তমান থাকতে আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করা সুকঠিন। উহাতে আপনার যদি একান্ত অভিলাষ হয়ে থাকে, তাহা হলে প্রথমে জরাসন্ধকে বিনষ্ট করে বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত করলে, আপনি নিঃসন্দেহ পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন এবং রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারবেন। তাহা না হলে আপনার অভিপ্রেত যজ্ঞ কখনই সুসম্পন্ন হবার সম্ভাবনা নাই। এখন দেশ, কাল, কার্য বিবেচনা করে কর্তব্য অবধারণপূর্বক আপনার যাহা অভিপ্রায় হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করুন।

[মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ১৪]

শ্রীকৃষ্ণের নীতিগর্ভ সর্বোৎকৃষ্ট সুপরামর্শ এবং হিতকর উপদেশ শ্রবণ করে যুধিষ্ঠির তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং সেই উপদেশেরই বশবর্তী হয়ে জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করতে গেলে মহান অনর্থ ঘটবে, এই ভেবে হতাশ হলেন ও শান্তি অবলম্বন করতে চাইলেন। কিন্তু অর্জুন বললেন, আমাদিগের রাজসূয় যজ্ঞ করা অপেক্ষা জরাসন্ধকে বধ করে বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত করাই মহৎ যশের কর্ম। ইহা না করলে লোক আমাদিগকে হীনবীর্য্য বলে উপহাস করবে। জরাসন্ধকে বধ করে বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত করলে, সাম্রাজ্যও যে আপনা-আপনিই হস্তগত হবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভীমার্জুনের একান্ত ইচ্ছা যে, জরাসন্ধকে বধ করে বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত করেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের নিকটে জরাসন্ধের বধের উপায় জিজ্ঞাসা করলেন এবং জরাসন্ধ কীরূপে এত বড় দুর্জয় হয়েছেন, তাহাও জানতে চাইলেন।

[মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ১৫-১৭]

ভারতবর্ষের সমস্ত রাজগণের, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস শ্রীকৃষ্ণ বিদিত ছিলেন। কাহার কীরূপ শক্তি, কাহার কীরূপে মৃত্যু, তিনি সকলই জানতেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ সুপণ্ডিত বলে বিখ্যাত ছিলেন, তাই তাঁহার নিকটে জরাসন্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত

জানতে যুধিষ্ঠির আগেই প্রকাশ করলেন। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ, জরাসন্ধের পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস বলে তাঁহার জন্ম ও কি কি কারণে তিনি ভূর্জয় হয়েছিলেন এবং যুদ্ধকালে হংস ও ডিম্বক যে তাঁহার পার্শ্ব রক্ষা করত, তাহাতে যে তিনি অজেয় ছিলেন, তাহা সমস্তই বিস্তারিতরূপে বললেন। তা শুনে যুধিষ্ঠির একেবারেই হতাশ হলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, জরাসন্ধের পার্শ্বচর বীরদ্বয়ের মৃত্যু হয়েছে, সুতরাং তাঁহাকে বধ করবার এই-ই উপযুক্ত সময়। কিন্তু ঐ দুরাত্মা নৃশংস, বন্দীকৃত রাজগণকে সংহার করে স্বীয় অভীষ্ট সাধন না করতে করতেই তাকে বধ করা উচিত। হে ধর্মাত্মন ! এক্ষণে যিনি ঐ পাপাত্মার নিঠুর কর্মে বিঘ্নোৎপাদন পূর্বক বন্দীকৃত রাজাদিগকে মুক্ত করতে পারবেন, তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল বিরাজিত রইবে। যিনি ঐ পাপিষ্ঠকে সংহার করবেন, নিঃসন্দেহ তিনিই সামাজের অধিকারী হবেন। ছিদ্রানুসারে নীতি-প্রয়োগে আক্রমণ করলে, প্রবল শত্রুকেও অনায়াসে নিপাতিত করা যায়।

অধার্মিক অত্যাচারী দুষ্টকে সংহার করে ধর্ম-সংস্থাপন করাই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য; সূতরাং তিনি জরাসন্ধকে বধ করতে উৎসাহী হয়েছেন এবং ভীমার্জুনকে তাঁহার সঙ্গে দিতে বলতেছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, হে রাজন ! যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ এবং বিশ্বাস থাকে, তবে ভীমার্জুনকে আমার হস্তে ন্যাস স্বরূপ অর্পণ করুন। তখন যুধিষ্ঠির ভীমার্জুনের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, হে মধুসূদন ! তুমি আর আমাকে লজ্জা দিও না। তুমি আমাদিগের অধীশ্বর, আমরা তোমার আশ্রিত। তুমি যাই বলবে, আমরা তাই করব। তোমার কথায় আমি জরাসন্ধকে নিহত, বন্দীকৃত রাজগণকে মুক্ত এবং নিজেও অভিলষিত যজ্ঞের উপযুক্ত বলে মনে করতেছি।

[মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ২০]

শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের বল-বিক্রম সমস্তই পরিজ্ঞাত ছিলেন। অস্তযুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করতে পারা যাবে না, এই বিবেচনাতেই তিনি স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ পরিগ্রহ করলেন এবং ভীমার্জুনকেও ঐ বেশ ধারণ করালেন; তাঁহারা অস্ত্রাদি কিছুই সঙ্গে নিলেন না। স্নাতক ব্রাহ্মণ সমধিক আদরণীয়; সুতরাং জরাসন্ধের নিকটে বিনা-বাধায় যাবার পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা, তাই স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে ভীমার্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণ মগধদেশে গমন করলেন। তাঁহারা কতিপয় দিবস মধ্যে জরাসন্ধের রাজ-ধানীতে পৌছিয়ে, চৈত্যক-ভূধরের শৃঙ্গ ও ভেরীত্রয় ভগ্ন করলেন এবং রাজবাটীর অপ্রকাশ্য দ্বার দিয়ে প্রবেশপূর্বক একবারেই রাজ-সন্নিধানে উপনীত হলেন। তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র জরাসন্ধ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করতে লাগলেন, ও আসন

প্রদানপূর্বক পাদ্যার্ঘাদি আনবার জন্য ভৃত্যদিগকে অনুজ্ঞা করলেন। তখন তাঁহার তাদৃশ সামাজিকতা দর্শনে ভীমার্জুন মৌনাবলম্বন করে বললেন; মহাবুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে রাজন ! ইহারা নিয়মস্থ আছেন, এজন্য এক্ষণে কোন কথাই বলবেন না; অর্ধরাত্র অতীত হলে আপনার সহিত আলাপ করে পরিতৃপ্ত হবেন। অতঃপর রাজা তাঁহাদিগকে যজ্ঞশালায় সংস্থাপিত করে স্বগৃহে প্রবেশ করলেন এবং যথোক্ত সময়ে গিয়ে বীরত্রয়ের নিকটে উপনীত হলেন।

[মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ২১, শ্লোক ১২-৩৩]

মহাভারতে, শত্রু গৃহে শ্রীকৃষ্ণ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায়। তিনি যেমন বীববংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, শত্রুগৃহে শত্রুর কথার উত্তরও সেইরূপই দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যই ধর্ম-সংস্থাপন করা এবং অধার্মিক লোকদিগকে সংহার করা। ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই তাঁহার অবগত ছিল, তিনি সকল বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন বলেই লোকে তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান করত। শ্রীকৃষ্ণ সতাবাদী, জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি কখনই জায়গায় জায়গায় মিথ্যা কথা বলে, চতুর্ভুজমূর্ত্তি সেজে, লোক-ভুলানের পসার খুলেননি। কথার কাঙ্গাল কিংবা শত্রুগৃহে ভীরু ছিলেন না যে, জরাসন্ধ নিকটবর্তী হয়েই তিনি 'মঙ্গল হোক' বলে তাঁহাকে আশীর্বাদ করে ছিলেন। তিনি কখনই আতিথ্য-বেলায় আমরা তিনটি ব্রাহ্মণ উল্লেখে মিথ্যা কথা বলে বাঞ্চা করেন নাই। বস্তুত শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র মাটি করেছে।

জরাসন্ধের এরূপ নিয়ম ছিল যে, রাত্রিশেষেও যদি স্নাতক ব্রাহ্মণ সমাগত হওয়ার কথা শুনেছেন, তবে তৎক্ষণাৎই এসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করতেন।

[মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ২১, শ্লোক ৩৬]

অনায়াসে জরাসন্ধের সাক্ষাৎ-লাভ উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ স্নাতক ব্রাহ্মণ হয়ে ছিলেন। কেননা, ক্ষত্রিয়বেশে গেলে, সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র, রথ-রথী, সমস্তই নিতে হয়; সুতরাং তাঁহার দেখা পাওয়া আর সহজ-সাধ্য হয় না। তাহার পর তাঁহাকে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্য তিনি অস্ত্রাদিও নিয়ে আসেন নাই। এই নীতি অবলম্বনেই শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে গিয়ে ছিলেন।

অর্দ্ধরাত্র সময়ে যজ্ঞশালায় ব্রাহ্মণ-বেশধারী বীরত্রয়ের নিকট উপস্থিত হয়ে জরাসন্ধ তাঁহাদের অপূর্ব বেশভূষা দর্শনে চমৎকৃত হলেন। তাঁহারা রাজাকে আশীর্বাদ করলেন, আপনার মোক্ষপদ প্রাপ্তি হোক। অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে উপবেশন করতে বলাতে, তাঁহারা উপবিষ্ট হয়ে যজ্ঞীয় অগ্নিত্রয়ের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন।

জরাসন্ধ বীরত্রয়কে রক্তচন্দন পুষ্পমালা পরিগ্রহ করতে দেখে বললেন, হে স্নাতক ব্রাহ্মণত্রয় ! আমি অবগত আছি যে, স্নাতক ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ সময় ভিন্ন কদাপি পুষ্পমালা ব্যবহার করেন না; তোমাদের নিয়ম দেখতেছি তাহার বিপর্য্যয়। অধিকন্তু দেখতেছি, তোমাদের হস্তে শরাসনাকর্ষণ-চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা কে, স্বরূপ বর্ণন কর। তোমরা ক্ষত্রিয়-তেজ ধারণ করে কী নিমিত্ত স্নাতক ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতেছ ? তোমাদের কপট-বেশ ধারণের অভিপ্রায় কী, তাহা বল। তোমরা রাজদণ্ডের ভয় না করে চৈত্যক-ভূধরের শৃঙ্গ ভেদপূর্বক অপ্রকাশ্য দ্বার দিয়ে কী নিমিত্তে এ স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছ ? ব্রাহ্মাবেশে এসেও মৎপ্রদত্ত সৎকার গ্রহণ করতেছ না, তোমাদের অভিসন্ধি কি ?

[মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ২১, শ্লোক ৩৭-৪৭]

জরাসন্ধের বাক্যাবসানে বাগ্মিপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে রাজন ! আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলে আপনার যেরূপ বিশ্বাস জন্মেছে, তাই থাকুক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণই স্নাতকব্রতে ব্রতী হতে পারেন। তন্মধ্যে বিশেষ নিয়মধারী ক্ষত্রিয়গণ সর্বদাই সৌভাগ্যশালী হন। পুষ্পমাল্য ধারণ করে সে নিঃসন্দেহে শ্রীমন্ত হয়। এই বিশ্বাসেই আমরা মাল্য ধারণ করেছি। হে জরাসন্ধ ! ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় বাহু দ্বারাই আপনার ক্ষমতা ও বীর্য্য প্রকাশ করে থাকেন। তাঁহাদের কথায় কিছুই তেজ প্রকাশ পায় না। ক্ষত্রিয়দিগের সৃষ্টিকালে বিধাতা তাঁহাদিগের বাহুদ্বয়ে স্বকীয় বীর্য সংস্থাপিত করেছেন। যদি তোমার তাহা দেখতে বাসনা থাকে, তাহা হলে অনতিবিলম্বে তাহা দেখতে পাবে। নীতিশাস্ত্রের মর্মই এই যে, শত্রু-গৃহে প্রবেশ করতে হলে অদ্বারে এবং বন্ধুবান্ধবের গৃহে প্রকাশ্য দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। তুমি ইহা অবগত হও যে, আমরা বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তই গুপ্তদ্বার দিয়ে তোমার গৃহে প্রবেশ করেছি। শত্রুর পরিচর্যা গ্রহণ না করা আমাদিগের চিরপ্রসিদ্ধ কৌলিক নিয়ম।

[মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ২১, শ্লোক ৪৯-৫৪]

জরাসন্ধ বললেন, হে ব্রাহ্মণগণ ! আমি যে, কোন সময়ে তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করেছি, তাহা স্মরণ হচ্ছে না। যদি আমি কখন শত্রুতা না করে থাকি, তবে তোমরা কীজন্য আমাকে শত্রু মনে করতেছ ? যিনি অকৃতাপরাধে অন্যের ধর্মে উপঘাত করেন, তিনি নারকী হন। ক্ষাত্র ধর্মই সৎপথের প্রবর্তক। আমি ধর্মানুরাগী। আমি কখনই প্রকৃতিমণ্ডলের কোন অপকার করি নাই, তবে কী নিমিত্ত আমাকে শত্রু মনে করতেছ ?

[মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ২২, শ্লোক ১-৬]

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে রাজন ! তুমি বলপূর্বক বহু রাজাগণকে পরাজয় করে বলিপ্রদানার্থ তাঁহাদিগকে বন্দী করে রেখেছ। এইরূপ ক্রুর আয়োজন করেও তুমি কীভাবে নিজেকে নিরপরাধ বলছো ? তুমি কোন বিবেচনায় তাহাদিগকে মহাদেবের পূজায় বলি দিতে বাসনা করেছ ? আমরা ধর্মচারী, ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ। তোমার দোষে আমাদিগকেও অপরাধী হতে হবে। আমরা কস্মিনকালেও নর-বলির নাম শ্রবণ করি নাই। তুমি কী নিমিত্ত শশাঙ্কশেখরের আরাধনায় নর-বলি দিতে উদ্যত হয়েছ ? হে জরাসন্ধ ! তুমি সর্বগণ পশুভূত করে নিতান্ত নির্বোধের কর্ম করতেছ। তুমি ব্যতীত কোন নরাধম আর এরূপ কর্ম করতে ইচ্ছা করে থাকে ? আর্ত্তের দুঃখ বিমোচন করাই আমাদিগের কুলব্রত। কিন্তু তুমি আর্ত্ত-জ্ঞাতিগণের উচ্ছেদে কৃতসঙ্কল্প হয়েছ। অতএব এক্ষণে আমরা জ্ঞাতিগণের কল্যাণ-কামনায়, তোমাকে বিনষ্ট করতে এখানে এসছি। তুমি মনে করেছ যে, এই ভূমণ্ডলে তোমার সদৃশ বীর-পুরুষ আর কেউই নাই। তাহা কেবল তোমার মতিভ্রম। ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গলাভ-বাসনাতেই রণযজ্ঞে দীক্ষিত হয়। বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশ, তপস্যা ও সংগ্রাম-মৃত্যু, এই চতুর্বিধ কর্মের প্রত্যেকই স্বর্গলাভের মুলীভূত। তন্মধ্যে বেদাধ্যয়নাদি যথানিয়মে সম্পন্ন না হলে স্বর্গলাভের ব্যতিক্রম ঘটে থাকে; কিন্তু ক্ষত্র-কুলোচিত বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক সংগ্রামে জীবন-বিসর্জন করলে, স্বর্গলাভ হবেই হবে, কোন মতে অন্যথা হবার নয়। আমাদিগের সহিত শত্রুতা হওয়ায় তোমার স্বর্গারোহণের মুখ যেরূপ পরিষ্কার হয়েছে, সেরূপ কাহারও ভাগ্যে ঘটে উঠে না। তুমি অসংখ্য মাগধ-বলে দর্পিত হয়ে প্রায় সকল রাজারই অবমাননা করে থাক, তোমার অহঙ্কার নিতান্ত অসহ; অতএব তাহা পরিত্যাগ কর। নতুবা সপরিবারে তোমাকে যমালয়ে গমন করতে হবে। আমরা ব্রাহ্মণ নহি, কেবল ছলনা দ্বারা তোমাকে নিহত করার উদ্দেশেই ছদ্মবেশ ধারণ করেছি। আমরা তিন জনই ক্ষত্রিয়। আমি হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ, আর এই দুই বীর স্বর্গীয় পাণ্ডুরাজার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র ভীমসেন ও ধনঞ্জয়। আমরা তোমার সহিত যুদ্ধ করতে প্রার্থনা করতেছি। তুমি হয় যাবতীয় বন্দীকৃত নৃপতিকে মুক্ত করে দাও, নতুবা প্রশান্তমনে আমাদের সহিত যুদ্ধ করে শমনভবনে গমন কর।

[মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ২২, শ্লোক ৭-২৬]

জরাসন্ধ বললেন, হে কৃষ্ণ ! আমি পরাজয় না করে কোনো রাজাকেই আনি নাই। আমি ক্ষত্রিয়-ধর্মানুসারে যুদ্ধে পরাস্ত করে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বদ্ধ করে রেখেছি। এখন কি তোমাদের কথায় ভীত হয়ে ছেড়ে দিব ? তুমি যে যুদ্ধের কথা বলতেছ, আমি তাহাতে সম্মত আছি। আমি একাকী তোমাদের এক বা দুই অথবা এককালে তিনজনের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে পারি। অতঃপর জরাসন্ধ

তাঁহার পুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করি আদেশ দিলেন এবং কৌশিক ও চিত্রসেন নামক দুই বীরকে স্মরণ করলেন। পূর্বে ইহারাই হংস ও ডিম্বক দমে তার পার্শ্বচর ছিল। জরাসন্ধ যাদবগণের বধ্য নয় বলে বিধাতার বাক্য স্মরণপূর্বক বাসুদেব স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন না।

[মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ২২, শ্লোক ২৭-৩৬]

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বাসুদেব জরাসন্ধকে যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় জেনে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জরাসন্ধ! আমাদের মধ্যে কাহার সহিত তোমার যুদ্ধ করতে ইচ্ছা হয়, তোমার সঙ্গিত যুদ্ধার্থে কে সজ্জীভূত হবেন ? মহাবল জরাসন্ধ ভীমসেনকে বিপুলকায় দেখে তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করার বাসনা প্রকাশ করলেন।

[মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ২৩, শ্লোক ২,৩]

জরাসন্ধ প্রস্তুত হয়ে ভীমসেনকে বললেন, ভীমসেন ! তুমি অগ্রসর হও; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করব। ইহার পর ভীমসেনকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, ভীমসেন কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করে সগর্বে জরাসন্ধের সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। নিরায়ুধ বাহু'মাত্র-সহায় দুই বীর পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হয়ে শার্দ্দূলের ন্যায় প্রহৃষ্টচিয়েও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। পরস্পরে বরগ্রহণ, পদাভিবন্ধন ও জঙ্ঘাঘাত দ্বারা রাজ-ভবনের প্রকোষ্ঠ সকল কম্পিত করলেন। মুষ্ট্যাঘাত চপেটাঘাত ইত্যাদিতে পরস্পর পরস্পরকে পীড়ন করতে লাগলেন। তাঁহাদের উভয়ের বাহসুদ্ধ দর্শনার্থ বহুলোক সমাগত হলো। ঐ বীরদ্বয় ত্রয়োদশ দিবস পর্যন্ত অনাহারে অবিশ্রামে যুদ্ধ করলেন, চতুর্দশ দিবসে জরাসন্ধ শ্রান্ত ও ক্লান্ত হলেন। তখন ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক উত্তেজিত হয়ে জরাসন্ধকে বধ করার বাসনায় দৃঢ়রূপে আক্রমণ করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, হে কৃষ্ণ ! বিপক্ষ এখনও অজেয়ভাবেই রয়েছে; এ অবস্থায় কীরূপে ইহাকে উপেক্ষা করতে পারি ? শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ভ্রাতা ! বিলম্ব করবার আবশ্যক কী ? তোমার দুর্লভ দৈববল, যাহা তুমি প্রভঞ্জন হতে প্রাপ্ত হয়েছ, তাহা আর কবে কাহার প্রতি নিয়োজিত করিবে ? শ্রীকৃষ্ণের সাঙ্কেতিক বাক্যের মর্মবোধ করে ভীম জরাসন্ধকে উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্বক মস্তকোপরি ঘুরাতে লাগলেন। এইরূপে শতবার ঘুরিয়ে সবলে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন এবং জানু দ্বারা তাহার মেরুদণ্ড ভগ্ন করে নিষ্পেষণপূর্বক বধসাধন করলেন। তখন ভীমসেনের গভীর গর্জনের শব্দে সমস্ত লোক ত্রাসিত ও ভয়ে ব্যাকুলিত হলো। তৎপরে তাঁহারা ভ্রাতৃত্রয় মিলিত হয়ে বহির্গত হলেন এবং জরাসন্ধের সজ্জাকৃত রথে আরোহণ করে দুর্গ হতে বন্দীকৃত রাজাদিগকে মুক্ত করলেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব অমাত্যগণসহ বীরত্রয়ের নিকট উপনীত হয়ে

বহুমূল্য রত্নাদি প্রদানপূর্ব্বক শরণাপন্ন হলেন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভয়প্রদানান্তে পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগকে ডেকে বিধানানুসারে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। কারামুক্ত রাজাগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্নিহিত হয়ে বললেন, আপনারা আমাদিগকে প্রাণ-দান করলেন। এখন এই ভৃত্যদিগের কী কর্তব্য, অনুগ্রহপূর্বক আদেশ প্রদানে চরিতার্থ করুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করবেন। আপনারা সেই যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে আনুকূল্য করবেন। রাজগণও তাহাই করব বলে অঙ্গীকার করলেন।

অতঃপর তাঁহারা অতি শীঘ্রগমনে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হলে, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম-কর্তৃক জরাসন্ধ-বধ বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক যুধিষ্ঠিরের নিকটে বললেন। কারামুক্ত রাজগণ ধর্মরাজের অনুমতি গ্রহণে স্বীয় স্বীয় রাজ্যে গেলেন। বাসুদেবও পিতৃষসা ও সুভদ্রা এবং পঞ্চভ্রাতার নিকট বলে দ্বারকায় গমন করলেন। এদিকে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দিগ্বিজয়ে বহির্গত হলেন।

[মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ২৩, শ্লোক ৪-৩৫ ॥ তথা ২৪ অধ্যায়]

মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের দূরদর্শিতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যতদূর সম্ভবে তাঁহার অদূরদর্শিতা। জরাসন্ধের নিকটে, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের নীতি-কৌশল ও বীরোচিত গর্বিত বাক্য, আর শ্রীমদ্ভাগবতে ভীরুতার অবলম্বনে আতিথ্য বেলার যাচ্ঞা বাক্য। শ্রীমস্তাগবতের শ্রীকৃষ্ণ কথার কাঙ্গাল। উদ্দেশ্যের বিপর্যয়ে ভয়াকুলিত চিত্তে, 'মঙ্গল হউক' বলে জরাসন্ধের প্রতি কথিত তাঁহার আশীর্বাদ বাক্যাদি এবং মহাভারতের পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বীক-পটতা ও শক্তিপূর্ণ তীক্ষ্ণ বাণস্বরূপ বাক্য প্রভৃতির একত্র সমাবেশ করলে, উভয় গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণ, জরাসন্ধ কিংবা জরাসন্ধ-বধ বৃত্তান্ত, কখনই এক বলে বোধ হয় না। এই প্রস্তাবে কার্যত শ্রীমদ্ভাগবতকার যে ভগবানের নির্মূল যশ ধ্বংস করে তাঁহার কুৎসা রচনা করেছেন, ইহা পাঠ বা শ্রবণ করলে যে মহাপাপে নিপতিত হতে হবে, তাহার বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ যে ব্যাসদেবের নামে কৃত্রিম করা হয়েছে, বর্ণিত প্রস্তাবও তাহার বিশুদ্ধ প্রমাণ।

— ✰ —

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্বন্ধ চতুঃসপ্ততিতম (৭৪) অধ্যায়ে —
শিশুপাল বধ বৃত্তান্ত

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের সভাস্থ সকলের মধ্যে কাহার পূজা অগ্রে হবে, সদস্যগণ এই কথার আন্দোলন করতে লাগলেন। তখন সহদেব বললেন, শ্রীকৃষ্ণের পূজাই পূর্বে হবে। শ্রীকৃষ্ণই আত্মা; শ্রীকৃষ্ণই অগ্নি, যজ্ঞ, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্তা; শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর। অতএব তিনিই অগ্রে পূজা পাওয়ার যোগ্য। তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ পূজা দান করুন। তাহলে সকল ভূতের, সকল আত্মার পূজা করা হবে, ইত্যাদি। ইহা শ্রবণে ব্রাহ্মণগণ সহদেবকে সাধুবাদ করলেন। তাহার পর যুধিষ্ঠির সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পাদপ্রক্ষালন করে, ভার্যা, ভ্রাতৃগণ ও সুহৃদগণসহ সেই জল মস্তকে ধারণপূর্বক তাঁহার পূজা করলেন। তখন নয়ন অশ্রুপূর্ণ হওয়াতে তিনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তা দর্শনে শিশুপাল গর্জন করে উঠলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে গালাগালি দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র সহ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও রাজগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধ করতে উদ্যত হলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাগিকে নিবারণ করে, নিজেই ক্ষুরধার চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করে ফেললেন, ইত্যাদি।

এই প্রস্তাব সম্পর্কে মহাভারতের কথা না আনলেও, সম্রাট যুধিষ্ঠিরের পিতামহ ভীষ্মদেব এবং পিতৃরা প্রভৃতি উপস্থিত ও যজ্ঞকার্য্যে লিপ্ত থাকা সত্বে, সুধিষ্ঠিরের মত একটা সুবিবেচক ধার্মিক রাজা, তাঁহাদিগের নিকট কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করে কর্ম করলেন সহদেবের বাক্যে। সহদেব কিন্তু সর্বকনিষ্ঠ। তিনিও কিন্তু অমনতর ফাজিল ছিলেন না যে, এতবড় বিজ্ঞ বিচক্ষণ মুরুব্বিদিগকে লঙ্গন করে ফাজিল কথা বলবেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার হইলেও মানবদেহে যে সম্পর্কে যাহার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তিনি প্রীতমনে তাহাই করতেন। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাই সম্পর্কানুসারে কৃষ্ণ তাঁহাকে অভিবাদন করতেন। যুধিষ্ঠির আবার শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলে জানলেও, কনিষ্ঠ-জ্ঞানে তাঁহাকে মনে প্রাণে স্নেহ এবং যারপরনাই বিশ্বাস করতেন। তিনি কখনও শ্রীকৃষ্ণের বাক্য লঙ্ঘন করতেন না। ইহাতেই পাদপ্রক্ষালন করে সপরিবারে মস্তকে জসধারণ কিংবা সহস্র পূজা অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ সহস্র গুণে প্রসন্ন হতেন। সকলেই জানিত, পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের সর্বময় কর্ত্তা। বস্তুতঃ পাণ্ডবগণ অথবা শ্রীকৃষ্ণ কখনই সম্পর্ক ত্যাগ করে কোন অমানুষিক ব্যবহার করেন নাই।

ব্যাসদেবের মহাভারতে রাজসূয়-যুক্ত যে ভাবপ গঠিত হয়েছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার পদে পদে বিপরীত। মহাভাবতে কোন সদক্ষ ব্রাহ্মণ কখনই রাজগণকে পূজা দেওয়ার কথা উত্থাপন করেন নাই, অথবা সহদেব সর্বকনিষ্ঠ হয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে এবং গুরুজনকে উল্লঘনপূর্বক কিছুই বলেন নাই। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ কখনই ঈশ্বররূপে উপস্থিত হন নাই; তিনি রাজসভায় রাজগণের সহিত সামাজিকরূপে অসীন ছিলেন এবং পাণ্ডবগণের সুহৃদরূপে রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের পদ-প্রক্ষালনের কার্যভার গ্রহণ করে ছিলেন। পাণ্ডবগণের পিতামহ ভীষ্ম-দেবই যজ্ঞান্তে যুধিষ্ঠিরকে বলে ছিলেন, সমাগত সুহৃদ, ব্রাহ্মণ এবং রাজাদিগকে অর্ঘ্য প্রদান করা উচিত। তাহাতে যুধিষ্ঠির পিতামহকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজগণের মধ্যে এই অর্ঘ্য প্রথমে কাকে দিতে হবে, আপনি তাহা অনুমতি করুন। তৎপরে ভীষ্মদেব কিছুকাল মৌনাবলম্বনে থেকে সুবিবেচনা পূর্বক রাজগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব অত্যধিক বলে, প্রথমে তাঁহাকেই অর্ঘ্য দিতে অনুমতি দিয়ে ছিলেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠির সর্বানুজ সহদেব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দেওয়ালেন। তদ্দর্শনে শিশুপাল ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির এবং শ্রীকৃষ্ণকে গালাগালি করে বহুরাজাসহ সভা হতে চলে যেতে উদ্যত হলে, যুধিষ্ঠির অগ্রসর হয়ে মিষ্টবাক্যে তাঁহাদিগকে ফিরিয়ে ছিলেন। অতঃপর শিশুপাল পুনরপি ভীষ্ম এবং কৃষ্ণকে নিন্দা ও ভৎসনা করতে লাগলেন। তাহাতে ভীম-পরাক্রম ভীমসেন ক্রোধান্ধ হয়ে শিশুপাল-বধে সমুদ্যত হলে, ভীষ্মদেব তাঁহাকে ধরে রাখলেন, সভাস্থ সকলকে শিশুপালের জন্মবৃত্তান্ত ভীষ্মদেব তাঁহাকে ধরে শুনালেন এবং শিশুপালের মৃত্যু যে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে, তাহাও বলে ফেললেন। তাঁহার পর আবারও শিশুপাল গভীর গর্জনপূর্বক তুচ্ছোক্তিতে কালান্তক যমোপম শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জঘন্য ব্যবহার ও অত্যাচারের বর্ণনা করে এবং যে কারণে তিনি উহার শত অপরাধ ক্ষমা করেছেন, এক্ষণে শতাধিক অপরাধ হওয়ায় তাঁহার যে ক্রোধ হয়েছে, তাহার আর শান্তি হবার নহে, ইহা বলে, মনে মনে সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করলেন। স্মরণ মাত্রই সুদর্শন চক্র এসে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হলো; তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করে শিশুপালের মস্তক ছেদন করে ফেলিলেন। তন্মুহূর্তে তাঁহার ছিন্নদেহ হইতে একটি তেজ বহির্গত হয়ে সমস্ত লোকের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে মিশে গেল।

[মহাভারত – সভাপর্ব, অধ্যায় ৩৬, ৩৯, ৪০]

অবস্থা দেখে বোধ হয়, পরস্পরায় মহাভারতের কাহিনী শুনেই শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রন্থকার আন্দাজে, অনুমানে তাঁহার গ্রন্থে। অন্যপ্রকার লিখেছেন। তাঁহাতেই এত বিপর্যয় ও ব্যতিক্রম ঘটেছে, সন্দেহ নাই।

— ☆ —

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশতম (৫২) অধ্যায়ে —

কালযবন সৈন্যসহ মথুরা পুরীতে আগমন করলে, কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে মুচুকুন্দের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে, তাঁহার দ্বারা তাহার বিনাশ করালেন। অনন্তর তিনি স্বপুরে এসে ম্লেচ্ছ-সৈন্য ধ্বংসপূর্বক বলদেব সহ তাহাদিগের ধনরত্ব সমস্ত নিয়ে দ্বারকার যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে মগধরাজ জরাসন্ধ ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী অধিপতি হয়ে পুনরায় যুদ্ধ করতে আসলেন। তা দর্শনে কৃষ্ণ বলরাম পলিয়ে গিয়ে পর্বতে লুকালে, জরাসন্ধ অগ্নি জ্বালিয়ে সেই পর্বত পোড়াতে আরম্ভ করলেন। তখন কৃষ্ণ-বলরাম লম্ফ প্রদানপূর্বক একাদশ যোজন নিম্নভূমিতে পতিত হয়ে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকা নগরীতে প্রস্থান করলেন। কিন্তু জরাসন্ধ কিংবা তাঁহার সৈন্যাদি, কেউই তা জানতে না পারাতে, তাহারা পর্বতের অগ্নিতে, পুড়ে মরেছেন ভেবে বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হলেন।

[ভাগবত – দশম স্কন্ধ, অধ্যায় ৫২, শ্লোক ৫-১৪]

এই প্রস্তাবের কোন কথায় ভগবানের নির্মল যশ বর্ণনা করা হলো ? যবনদিগের ধনরত্ন অপহরণ করায়, না জরাসন্ধের ভয়ে পলিয়ে যাওয়ায়, না লম্ফ প্রদানপূর্বক একাদশ যোজন নিম্নে পতিত হওয়াতেও মৃত্যু না হওয়ায় ? এই সমস্ত কাল্পনিক বর্ণনা দ্বারা ভগবানের বিশুদ্ধ চরিত্রে এবং অতুল পরাক্রমে কলঙ্ক করা হয়েছে কি না ?

হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের অন্তর্গত ৪২ তম অধ্যায়ে, গোমন্ত পর্বতে জরাসন্ধের অগ্নিপ্রদান করা **(শ্লোক ৫৩)** ও অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করার কথা আছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণ-বলরাম যে যবন-সৈন্য বিনষ্ট করেছিলেন, কি প্রাণভয়ে পলিয়ে গিয়ে ছিলেন, তাহাতে এমন কোনো প্রসঙ্গ নাই; আছে যবনসৈন্য গ্রহণ করার কাহিনি।

হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের অন্তর্গত ৩৮ তম অধ্যায়ে দেখা যায়, রাজমন্ত্রী বিকদ্রু বিশেষ চিন্তা করে উগ্রসেন ও বসুদেবের সাক্ষাতে কৃষ্ণ-বলদেবকে বললেন, জরাসন্ধ এসে বারংবার মথুরা অবরোধ করতেছেন; মথুরায় কোন দুর্গ নাই, দ্বার সকল বিশৃঙ্খল এবং সৈন্য-সংখ্যাও অত্যল্প। এ অবস্থায় এই নগরে শক্রসৈন্ত প্রবেশ করলে আমাদের রাজ্য, জন-সমূহের সহিত বিনষ্ট হবে। পুরবাসী যাহারা আছে, তাহারা প্রাণের আশঙ্কায় দ্বিধাকৃত হতে উদ্যত হয়েছে। জরাসন্ধ কেবল তোমার জন্যই মথুরা অবরোধ করে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করে থাকেন। এই বলে তিনি যদুবংশের

ইতিহাস বললেন এবং, যদুর চারি পুত্র যে পর্বত ইত্যাদিতে পুরী নির্মাণ ও রাজ্য সংস্থাপন করে ছিলেন, সবিস্তারে তাহাও কীর্তন করলেন। তাহা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, বলদেবসহ আমরা দুই ভ্রাতা মথুরা পরিত্যাগ করে করবীরপুর, ক্রৌঞ্চপুর এবং গোমন্ত দর্শন করতে যাব। আমাদের বহির্গমন বার্তা শ্রবণ করলে জরাসন্ধ পুর প্রবেশ না করে অনুচরবর্গের সহিত নিশ্চয়ই আমাদিগের অন্বেষণে বনে যাবেন এবং আমাদের গ্রহণ বিষয়ে প্রযত্ন করবেন। অতএব আমাদিগের এই নির্গমনই আমাদের এবং যদুবংশের পক্ষেও শ্রেয়কর। ইহাতে দেশ, নগর ও পৌরগণের মঙ্গল হবে। শত্রু পলায়ন করলে, বিজিগীষু নরপতি শত্রুক্ষয় না করে ক্ষান্ত হন না।

[হরিবংশ – বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৩৭-৩৯]

তাহার পর কৃষ্ণ-বলদেব দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থানপূর্বক গোমন্ত পর্বতে আরোহণ করলেন এবং যেতে যেতে পরশুরামকে প্রাপ্ত হলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রকার উপদেশ দিয়ে হোম-ধেনুর দুগ্ধ পান করালেন ও গোমন্ত পর্বতে আরোহণ করতে বলে নিজে প্রস্থান করলেন। অতঃপর কৃষ্ণ-বলদেব গোমন্ত পর্বতের অতি উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করে বাস করতে লাগলেন।

[হরিবংশ – বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৪০, শ্লোক ১-৩, ৪৬-৪৮]

হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের ৪২,৪৩ অধ্যায়ে —

জরাসন্ধ নৃপতি বহুসংখ্যক সৈন্য ও স্বপক্ষীয় রাজগণ সমভিব্যাহারে যে সময়ে গোমন্ত পর্বত বেষ্টন করে অগ্নি প্রদান করলেন, তখন কৃষ্ণ-বলদেব সেই বিপুল-পরাক্রম, সংখ্যাতীত শত্রুসৈন্য মধ্যে পর্বত হইতে লম্ফ প্রদান পূর্বক অবতীর্ণ হয়ে তাহাদিগকে দলন করতে লাগলেন; চক্র, গদা, হল প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা অগণিত সৈন্য, হস্তী, অশ্ব, রুথ, রথী বিনষ্ট করলেন। বলদেব সমরে জরাসন্ধকে বধ করতে সমুদ্যত হলে, বিধাতা অদৃশ্যরূপে আকাশে থেকে বললেন যে, অন্যের হস্তে শীঘ্রই জরাসন্ধের মৃত্যু হবে। জরাসন্ধ তোমার বধ্য নহে; তুমি ক্ষান্ত হও। এই দৈববাণী শুনে বলদেব বিরত হলেন, জরাসন্ধও ভয়-ব্যাকুলিত-চিত্তে প্রস্থান করলেন। তাহার-শিষ্ট রাজগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে গেলেন। তৎপর চেদিরাজ রথ হতে অবতরণ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বললেন, হে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ! তোমরা আমার স্নেহের পাত্র। আমি তোমাদের পিতৃষ্বসাকে বিবাহ করেছি। আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও, দুর্মতি জরাসন্ধ বারংবার তোমার সহিত বৈরী করতেছে। যাই হোক, আমি আর ঐ নির্বোধের সহায়তা করব না। আমি তাহার সপক্ষতা পরিত্যাগ করলাম। এইক্ষণে চল, সন্নিহিত করবীর পুরে রাজা শৃগালের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করি। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করে চেদিরাজ-প্রদত্ত রথে আরোহণ-পূর্বক পথে ত্রিরাত্র অতিবাহিত করলেন এবং চতুর্থ দিবসে করবীর পুর প্রাপ্ত হলেন।

[হরিবংশ – বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৪২,৪৩]

রাজা শৃগাল তাঁহাদের আগমনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও রোষপরবশ হয়ে দেবদত্ত রথে আরোহণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের উপরে বহুপ্রকারের অস্ত্র প্রহার করলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমত সমস্তই সহ্য করে, পরে চক্র দ্বারা তাহাকে নিহত করলেন এবং তৎপুত্রকে ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত করে পিতৃসিংহাসনে বসিয়ে, যুদ্ধনির্জিত রথে আরোহণান্তে দমঘোষের সহিত প্রস্থান করলেন। অতঃপর তাঁহারা পথে একরাত্রের ন্যায় পঞ্চরাত্র অতিবাহিত করে মথুরায় উপনীত হলেন। তখন উগ্রসেন প্রভৃতি এসে তাঁহাদিগকে স্বপুরে নিয়ে গেলেন। কিছুদিন মথুরায় অবস্থানের পর শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং গরুড়ের সঙ্গে মন্ত্রণাপূর্বক দ্বারকায় পুরী নির্মাণ করতে পুত্রকলত্রাাদি সহ তথায় অবস্থিতি করতে লাগলেন।

[হরিবংশ – বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৪৪, শ্লোক ১,১২-১৪,৫৬-৫৮]

এদিকে জরাসন্ধ কীরূপে কৃষ্ণ-বলরামকে পরাস্ত করবে তাহার চিন্তা ও স্বপক্ষীয় রাজগণের সহিত মন্ত্রণা করে, অবনাধিপতি অতুলপরাক্রম মহারাজ কালযবনের নিকটে রাজসত্তম শাল্বকে প্রেরণ করলেন। শাল্ব গিয়ে বললেন, হে যবনাধিপ ! রাজেন্দ্র মগধরাজ আপনাকে যেরূপ বলেছেন, তাহা শ্রবণ করুন। পরম দুর্জয় কৃষ্ণ-বলদেব জগৎকে পাহাড়া দিতেছে। তাহা শুনে আমি বহু সৈন্য ও রাজাগণ সমভিব্যাহারে গমন করে ঘোরতর সংগ্রাম করেও তাঁহাদিগকে পরাস্ত করতে পারলাম না। অবশেষে গোমন্ত পর্বতে অগ্নিপ্রদান করলে, প্রবল পরাক্রান্ত বাসুদেব বলদেবের সহিত লম্ফ প্রদানপূর্বক আমাদিগের সৈন্য মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে, প্রথমে আমাদেরই হস্তী, অশ্ব, রথ উত্তোলন ও নিক্ষেপ দ্বারা বহু সৈন্য সহ হস্তীর প্রাণ সংহার করে, পরিশেষে আয়ুধ-গ্রহণে চক্র, গদা, হল ও মুষল দ্বারা আমাদিগকে বিমর্দ্দন করেছেন। আমরা নিতান্ত পরাস্ত ও পরাভূত হয়ে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করতেছি। আপনি যুদ্ধদুর্মদ বীরদ্বয়কে সংহার করে আমাদিগের প্রীতি বর্দ্ধন করুন। তাদের সংহার করতে আপনিই সক্ষম।

[হরিবংশ – বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৫৩, শ্লোক ২৬-৫৭]

কালযবন বললেন, হে মহাবাহো ! অসংখ্য রাজগণ যখন আমাকে কৃষ্ণনিগ্রহের নিমিত্ত অনুরোধ করতেছেন, তখন আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হলাম। রাজগণ যখন

হৃষ্টান্তঃকরণে আমার জয় অবধারণ করেছেন, তখন আমি অবশ্যই জয়লাভ করব; আমি প্রস্তুত হচ্ছি। এইরূপ বলে তিনি আশীর্বদ-প্রার্থনায় ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদিগকে প্রভূত ধন দান করলেন এবং বিধানানুসারে অগ্নিতে হোম ও আহুতি প্রদান করতে লাগলেন।

[হরিবংশ – বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৫৪]

কালযবন নিতান্ত ধার্মিক, সত্য ধর্মনিরত, অতুল পরাক্রমশালী এবং সমস্ত গৃহীপালগণের বিশেষতঃ দৈববলে অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের অজেয় ছিলেন। তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করার কোন উপায়ই ছিল না।

যদুপ্রবীর শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয়, প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, কালযবন ক্ষমাপরবশ হবেন না, তখন তিনি ঘোররূপ সুমহান একটি কৃষ্ণসর্প কলসে ভরে মুদ্রাঙ্কিত করলেন এবং দূত দ্বারা সেই সর্প-পূর্ণ ঘট যবনরাজের সন্নিধানে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে দূত যবনরাজের নিকটে গমন করে বলল, শ্রীকৃষ্ণ কালসর্প সদৃশ; এই কথা বলে সেই ঘট প্রদান করল। যাদবগণ যে তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন করবার নিমিত্তই এইরূপ করেছেন, কালযবন ইহা বুঝতে পেরে প্রচণ্ড পিপীলিকা সকল দ্বারা সেই কলস পূর্ণ করলেন। তাহাতে সেই সর্প অসংখ্য তীক্ষ্ণতুণ্ড পিপীলিকা দ্বারা ভক্ষিত ও ভস্মীভূত হয়ে গেল। তৎপরে কালযবন সেই কলস মুদ্রাঙ্কিত করে বহুল বর্ণনা সহকারে কৃষ্ণের নিকটে পুনঃ প্রেরণ করলেন।

[হরিবংশ – বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৫৭, শ্লোক ৩১-৩৭]

বাসুদেব স্বপ্রেরিত যোগের কালযবন-বিহিত প্রতিযোগ দর্শনে সত্বরে মথুরা পরিত্যাগ করে দ্বারকায় গমন করলেন এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণকে আশ্বস্ত করে বৈরী-সংহারের নিমিত্ত কেবলমাত্র সাহস সহকারে সুনীতি-অবলম্বী হলেন। যেরূপ আকাশকে কেউ লঙ্ঘন কিংবা, পরিমাণ করতে পারে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নীতি এবং অগাধ বুদ্ধিরও কেহ ইয়ত্তা করতে পারতো না।

[হরিবংশ – বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৫৭, শ্লোক ৩৮-৪০]

যবন রাজা বিপুল সেনায় পরিবৃত হয়ে মথুরায় যাত্রা করলেন। এদিকে যবন রাজার আগমন লক্ষ্য করে বাসুদেবও বাহুরূপ প্রহরণের সাহায্যে মথুরায় এসে তাঁহার সন্নিহিত হলেন। কালযবন তাঁহাকে দেখে হৃষ্ট এবং পরে রোষ সহকারে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হলেন। মান্ধাতৃ-তনয় রাজা মুচুকুন্দ যে স্থানে যে কারণে নিদ্রিত রয়েছেন, দেবর্ষি নারদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ তাহা সম্যক অবগত হয়ে ছিলেন। সেই

≈≈≈

মহাত্মা দেবগণের সাহায্যার্থ দৈত্যযুদ্ধে জয়লাভ করাতে দেবগণ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে বারংবার বরগ্রহণ করতে বলে ছিলেন। রাজা মুচুকুন্দও দৈত্যযুদ্ধে ক্লান্ত হওয়াতে, বারংবারই যাহাতে দীর্ঘ নিদ্রা যেতে পারেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে জাগরিত করবে, রোষচিত্তে তাহার প্রতি দৃষ্টি করলে, সেই ব্যক্তি যাহাতে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়, এই বর চেয়ে ছিলেন। দেবগণ 'তাহাই হবে' বলে বর প্রদান করেন। তদবধি তিনি সেই দেবদত্ত-বর-প্রভাবে পর্বত গুহায় নির্জন স্থানে শয়ন রয়েছেন। নীতিবিশারদ শ্রীকৃষ্ণ, যবন রাজার সঙ্গে অস্ত্রযুদ্ধ না করে, মল্লযুদ্ধ করার আভপ্রায় প্রকাশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ায়, যবনরাজ তৎপ্রতি ধাবিত হলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্রুতবেগে পদচারণ করে যেস্থানে মহারাজ মুচুকুন্দ নিদ্রিত আছেন, সেই দিকেই চললেন। যবন রাজাও তাঁহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করলেন। যেতে যেতে মুচুকুন্দ রাজা যেস্থানে শয়ন রয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ অতি সাবধানে সেই স্থানে গিয়ে, সেই মহাত্মার দৃষ্টিপথ অতিক্রমপূর্বক তাঁহার শিরোদেশের অন্তরালে লুকায়িত রইলেন। যবন রাজাও গুহায় প্রবেশ করে কেশবের অদর্শনে রোধপরবশ হয়ে রাজা মুচুকুন্দকে দৃঢ়রূপে পদাঘাত করলেন। তাহাতেই মুচুকুন্দ জাগরিত হয়ে ক্রোধ-দৃষ্টিতে যবন রাজাকে ভস্ম করে ফেললেন।

[হরিবংশ – বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৫৭, শ্লোক ৪১-৫৫]

বাসুদেব বুদ্ধিবলে এইরূপ কৃতকার্য হওয়াতে নিরতিশয় সন্তোষ লাভ করলেন এবং মহীপতি মুচুকুন্দের সন্নিহিত হয়ে বললেন, হে রাজন ! দেবর্ষি নারদের নিকট শুনেছি, আপনি বহুকাল নিদ্রিত ছিলেন। যাহা হোক, আপনি আমার মহৎ কার্য সম্পাদন করেছেন; আপনার মঙ্গল হোক। আমি যাচ্ছি। রাজা মুচুকুন্দ হ্রস্বপ্রমাণ বাসুদেবকে দেখে ভাবলেন, আমি বহুকাল নিদ্রিত ছিলাম। ইহার মধ্যে যুগ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। অনন্তর সেই নৃপ কেশবকে বললেন, আপনি কে, কী নিমিত্ত এখানে এসেছেন ? আমি কত কাল নিদ্রিত ছিলাম, ইহা যদি আপনার জানা থাকে, তবে বলুন। বাসুদেব বললেন, চন্দ্রবংশে নহুষ-নন্দন যযাতি নামে নরপতি ছিলেন। যদু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তুর্বসু প্রভৃতি আর চারজন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। হে বিভো ! আমাকে সেই যদুবংশে সমুৎপন্ন বসুদেবনন্দন বাসুদেব বলে জানবেন। আমি কার্যবশত আপনার নিকট এসেছিলাম। হে রাজন ! আমি নারদের নিকট শুনেছি, আপনি ত্রেতাযুগে প্রসুপ্ত হয়েছিলেন; সম্প্রতি কলিযুগ প্রবৃত্ত হয়েছে। আমি আপনার কোন কার্য করব, বলুন। হে নৃপ ! আমি শত বৎসর যুদ্ধ করেও সেই শত্রুকে সংহার করতে পারতাম না, আপনি দেবদত্ত বর প্রভাবে তাঁহাকে দগ্ধ করেছেন।

[হরিবংশ – বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৫৭, শ্লোক ৫৬-৬৩]

রাজা মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপ উক্তি শুনে গুহামুখ হতে নির্গত হলেন; ধীমান বাসুদেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতে লাগলেন। নৃপতি বহির্গত হয়ে দেখলেন, অল্পোৎসাহ, অল্পবল, অল্পবীর্য, হ্রস্ব-প্রমাণ নরগণে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত এবং আপনার রাজ্যও পরকর্তৃক অপহৃত হয়েছে। রাজা এই সকল দর্শনে তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হয়ে, প্রীতি সহকারে বাসুদেবকে বিসর্জন করে হিমালয়ে গমন করলেন এবং তপস্যা দ্বারা কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় কর্মবলে সুরপুরে আরূঢ় হলেন।

[হরিবংশ – বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৫৭, শ্লোক ৬৪-৬৭]

মহামনা ধর্মাত্মা বাসুদেব যখন-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে প্রভূত-রথ-হস্তি-অশ্ব সমন্বিত সেই নিহত যবন রাজার সৈন্যগণকে নিয়ে প্রস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি রাজা উগ্রসেনকে সেই চতুরঙ্গিণী বাহিনী প্রদান করে জয়-লব্ধ ধন দ্বারা দ্বারকাকে শোভিত করলেন। যবন রাজার সেনাগুলি মথুরায় রেখে গেলেন; বধ করেন নাই। ইত্যাদি।

[হরিবংশ – বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৫৭, শ্লোক ৬৮-৭০]

ভগবান বাসুদেবের এই যে সুমহৎ, নির্মল যশ রাজনীতির আদর্শরূপে হরিবংশে বর্ণিত রয়েছে; শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকার তাহা রুপান্তরে অতি বিপর্য্যয়ে লিখে একবারেই মাটি করে ফেলেছেন। তবে তিনি মুচুকুন্দ কৃত ভগবানের স্তব লিখেছেন বটে, কিন্তু স্তব দ্বারা যশঃকীর্তন হয় না; মহৎ কার্য দ্বারাই যশ প্রকাশিত হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকার হলে, হরিবংশে ভগবানের যে মহৎ যশ নিহিত রয়েছে, তিনি কখনই তাহার ধ্বংস করে, তদ্বিপর্যয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রস্তাব লিখতেন না। তাহার পর এই প্রসঙ্গ একবার হরিবংশে লিখে, তিনি আবার কেন শ্রীমদ্ভাগবতে লিখলেন ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে —

কংস প্রেরিত পুতনা, অঘাসুর, বৎসাসুর, কংস-সখা বকাসুর, তৃণাবর্তাসুর, ধেনুকাসুর ও শঙ্খচূড়াসুর প্রভৃতিকে কৃষ্ণ-বলদেব বিনষ্ট করলেন। তাহার পর কিন্তু কংস আর-কিছুই করলেন না। একদিন নারদ মুনি এসে কংসকে বললেন, দেবকীর অষ্টম গর্ভে যে কন্যা হয়, সে যশোদার কন্যা। কৃষ্ণ-বলরাম, দেবকী এবং রোহিণীর তনয়। বসুদেব ভয় পেয়ে তাঁহার মিত্র নন্দের নিকটে তাদের দুইজনকেই রেখে এসেছেন। উহাদের উভয় ভ্রাতার হস্তে তোমার চরগণের মৃত্যু হয়েছে। নারদ-মুখে ভোজপতি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে ক্রোধে বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং বসুদেবকে সংহার করার জন্য শাণিত খড়্গ গ্রহণ করলেন। কিন্তু নারদ মুনি বারণ করাতে তাঁহাকে বধ না করে লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করে রাখলেন।

গ্রন্থকার নারদকে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত বলে শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃপুনঃ প্রকাশ করেছেন ***[ভাগবত – দশম স্কন্ধ, সপ্তত্রিংশ অধ্যায়, শ্লোক ১১]*** এবং বসুদেব যে তাঁহার পুত্রদ্বয়কে নন্দের গৃহে রেখেছেন, ইহা জানিয়ে কংস পুতনা প্রভৃতিকে পাঠিয়ে তাঁহাদের বিনাশের চেষ্টা করেছেন, ইহাও শ্রীমদ্ভাগবতেরই লেখা। তবে গ্রন্থকার দশম স্কন্ধের ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে কংসের নিকটে নারদ মুনিকে উপস্থিত করিয়ে তাঁহারই পূর্ব বর্ণনা রদ ও বাতিল করলেন। ইহাই কি ব্যাসদেবের লেখা ? কেশব যে কংস-প্রেরিত প্রধান প্রধান সৈন্যগুলিকে নিহত করেছেন, কংসজী কি তাহা জানতে পারেন নাই ? নারদ কি ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের নিরীহ পিতামাতাকে বধ করতে বা কষ্ট দিতে কংসকে ঐরূপ সংবাদ দিয়ে ছিলেন ? বস্তুতঃ যে গ্রন্থে পূর্বপর এইরূপ বিপর্যয়, সেই গ্রন্থ কখনই ব্যাসকৃত নহে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়ে —
শ্রীকৃষ্ণের মহিষীকরণ সংবাদে

শ্রীকৃষ্ণ কোশল দেশের রাজকন্যা নাগ্নজিতীকে বিবাহ করলে কন্যার জনক যৌতুক ব্যবহারে পদককণ্ঠী, সুবেশা ত্রিসহস্র যুবতী পরিচারিকা, দশ সহস্র ধেনু, নয় সহস্র হস্তী, নয় লক্ষ রথ, নয় কোটি অশ্ব এবং নয় পদ্ম (অর্বুদ) সেবকও নব-দম্পতীকে প্রদান করে অপরিসীম আনন্দিত হলেন।

[ভাগবত – দশম স্কন্ধ, অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়, শ্লোক ৫০-৫১]

পাঠক বিবেচনা করে দেখবেন, সমগ্র ভারতবর্ষেই এত কোটি লোকের হওয়ার সম্ভবনা কম; এই অবস্থায় কোশল দেশ কত বড় এবং রাজারই বা কত পদ্ম দাস ছিল যে, তিনি তাঁহা হতে নয় পদ্ম দাস কন্যা ও জামাতাকে যৌতুক দিয়ে ফেললেন। পদ্ম পরিহাসের কথা নহে; উহার উপরে কিন্তু আর গণনাই নাই। তাহার পর রাজা যে ৯ পদ্ম দাস, ৯ লক্ষ রথ, ৯ কোটি অশ্ব, ৯ সহস্র হস্তী, ১০ সহস্র গাভী ও ৩ সহস্র দাসী দিয়ে ছিলেন, তাহা দ্বারকার মত অতটুকু দ্বীপে স্থান পেল কীরূপে ? কোশল দেশেই বা এতগুলি পশু ও দাস-দাসীর কী প্রকারে সমাবেশ হতো ?

এই সমস্ত কথাগুলি নিতান্তই অসম্ভব ও অমূলক; সুতরাং ইহা, কখনই ব্যাসকৃত রচনা বলে অনুমিত হতে পারে না।

সবচেয়ে বড় কথা হলো যেখানে ব্যাসদেব স্বয়ং মহাভারতে লিখেছেন, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী ছাড়া আর কোনো পত্নী ছিল না।

বৈদেহ্যাং চ যথা রামো রুক্মিণয়াং চ জনার্দনঃ

[মহাভারত – উদ্যোগ পর্ব, ১১৮/১৭]

সীতার জন্য যেরূপ রাম, সেইরূপ রুক্মিণীর জন্য কৃষ্ণ।

সেখানে তিনিই আবার তাঁর নিজের লেখার বিরোধীতা করে ভাগবতে নাগ্নজিতীকের সহিত কৃষ্ণের বিবাহ করিয়ে দিলেন ?

— ✰ —

≈≈≈

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে —
রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সংসার-ত্যাগ

বিদুর তীর্থ-দর্শন ও পৃথিবী পর্যটনপূর্বক হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন এবং পুরস্থিত সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণাদির পর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গিয়ে উপবিষ্ট হলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে বললেন, রাজন ! আর কী দেখতেছেন ? এক্ষণে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করুন। যে ভীমসেন আপনার পুত্রদিগকে নিহত করেছে, আপনি কুকুরের ন্যায় তাঁহাদেরই অন্নে শরীর পোষণ করতেছেন ! আপনি কী ছিলেন, কী হলেন ! ইত্যাদি বলে আরও বললেন, শীঘ্র গৃহ ত্যাগ করে অরণ্যে প্রবেশপূর্বক যোগাবলম্বনে ঈশ্বরের উপাসনা করতে প্রবৃত্ত হন, ইত্যাদি।

[ভাগবত – প্রথম স্কন্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, শ্লোক ১,১৮-২২]

বিদুরের এইরূপ তিরস্কার-বাক্য শ্রবণে রাজা ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ গৃহ ত্যাগ করে বনে গমন করলেন; গান্ধারী এবং বিদুরও তাঁহার অনুগামী হলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতিদিনই পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নীর চরণ বন্দনা করে থাকেন। সেই দিন কিন্তু তাঁহাদিগকে না দেখতে পেয়ে, সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন বটে, বস্তুত তাঁহার কাছেও কোনো নিশ্চয় উত্তর পেলেন না। অতপর তিনি দেবর্ষি নারদকে সমুপাগত দর্শনে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন ! আমার পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী কোথায় গেলেন ? নারদ বললেন, তাঁহারা হিমালয়ে উপস্থিত হয়ে তপস্যা করছেন, আজ হতে ৫ দিনের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র দেহ ত্যাগ করবেন। তুমি বৃথা শোক করিও না, তাঁহাদিগকে নিয়ে আসার আর অন্য কোনো উপায় নাই, ইত্যাদি।

[ভাগবত – প্রথম স্কন্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, শ্লোক ২৮-৩২,৩৭,৫৬]

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বে বিস্তৃতরূপে লিখিত রয়েছে। তাহাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তাব সময়ে, অথবা তাহার পরে, বিদুর কখনই তীর্থ কিংবা পৃথিবী-পর্যটনে বহির্গত হন নাই, পাণ্ডবদিগের অপ্রিয়, অপ্রীতিকর অথবা প্রতিকূলতা জনক কোন বাক্য, পুত্রশোক-সন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন নাই, তাঁহাকে বনগমনে বা সংসার-পরিত্যাগে প্রোৎসাহিত করেন নাই এবং বনে গিয়ে তপস্যা করতেও প্রবৃত্তি দেন নাই। ধৃতরাষ্ট্রও যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাতসারে পলাতকের ন্যায় বনবাসী হন নাই।

মহাভারতে আছে, কুরুক্ষেত্র-সমর-সমাধার পর, পাণ্ডব ও পাণ্ডব-মহিলাগণ পঞ্চদশ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে পিতামাতা নির্বিশেষে সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব কালে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার অনুমতি-গ্রহণে স্বেচ্ছামত দান ও যজ্ঞাদি করতেন। তাহার পর বার্ধক্য বশত বৃদ্ধ রাজার নির্বেদ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি ১৫ দিবস পূর্বে রাজা যুধিষ্ঠিরকে সবিশেষরূপে বলে এবং ব্যাসদেবের সাহায্যে বনগমনে তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক মৃত মহারথী পুত্রগণের তৃপ্তিজন্য যুধিষ্ঠিরের মত নিয়ে ক্রমান্বয়ে একাদশ দিবস পর্যন্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ধন, রত্ন, গ্রাম, হস্তী, অশ্ব-আদি দান, তৎপরে আত্মসফলতার নিমিত্ত দানাদি করে, অবশেষে বনে গমন করলেন। তৎকালে পুরস্থিত সকলেই তাঁহার অনুগমন করে ছিলেন বটে, কিন্তু কতক দূর গিয়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সুভদ্রা-আদি মহিলাগণ ফিরে বাড়ি আসলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তীদেবী, মহাত্মা বিদুর এবং মহামতি সঞ্জয় আর ফিরলেন না। কুন্তী দেবী যখন কোনো মতেই বন গমনে নিবৃত্ত হলেন না, তখন মাতা ও পিতৃব্যাদির শোকে যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ এবং দ্রৌপদী সুভদ্রা-আদি মহিলাগণ কেঁদে ব্যাকুলিত হলেন। কিছুদিন পরে মাতা এবং পিতৃব্য-পিতৃব্যপত্নীদিগের শোকে ও বিরহে তাঁহারা সকলে বসুন্ধরার ভোগসুখে তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করতে অসমর্থ হয়ে, সকলে সমভিব্যাহারে গুরুজন দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বনে প্রস্থানপূর্বক তাঁহাদের দেখা পেলেন, ইত্যাদি।

[মহাভারত – আশ্রবাসিক পর্ব, অধ্যায় ১,৩,১১,১৫-১৬,২২,২৪]

উভয় গ্রন্থে যখন এত বৈষম্য, এত পার্থক্য রয়েছে, তখন ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতের গ্রন্থকার কস্মিনকালেও এক ব্যক্তি হতে পারে না।

— ☆ —

≈≈≈

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে —

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ

আত্মবিরোধে যদুবংশ বিনষ্ট হলে, শ্রীকৃষ্ণ দেহ ত্যাগ করলেন। অতঃপর কৃষ্ণ-মহিষীদিগকে নিয়ে অর্জুনের হস্তিনায় গমন সময়ে, পথে কতক-গুলি নিকৃষ্ট গোপজাতি উপস্থিত হয়ে তাঁহাদিগকে নিয়ে গেল। তখন অর্জুন বহু চেষ্টাতেও ধনুর্বাণ চালাতে অক্ষম হয়ে মনে করলেন, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার তেজ হরণ করে নিয়েছেন। তদনন্তর তিনি হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় পূর্বে যে সকূল উৎকৃট কর্ম করেছেন, তাহা একে একে পুরবাসীদের নিকট বর্ণনাপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের সংবাদ বলে ফেললেন। দেবী কুন্তী, তাহা শ্রবণমাত্র শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে মন অর্পণ করে প্রাণত্যাগ করলে ***[প্রথম স্কন্ধ, ১৫ অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক]***। তাঁহার পর যুধিষ্ঠির হৃদয়ে কৃষ্ণচিন্তা করতে করতে যোগ ও মৌন-ব্রতাবলম্বনে পুরত্যাগ করে মহাপ্রস্থান করলেন ***[প্রথম স্কন্ধ, ১৫ অধ্যায়, ৩২ শ্লোক]।*** তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং দ্রৌপদী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। ইহাই রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

মহাভারতে কিন্তু কুন্তী দেবীর মৃত্যু শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের বহুদিন পূর্বে এবং তপোবনে হয়েছে, স্বপুরে হয় নাই। ***[প্রমাণঃ মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বের সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের শ্লোক ৩১-৩২]***

জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, পিতৃব্য-পত্নী গান্ধারী এবং জননী কুন্তীর বনগমনের বহুদিন পরে, পাণ্ডবগণ অন্তঃপুরস্থ সমস্ত মহিলাগণ-সমভিব্যাহারে তপোবনে গিয়ে, এক মাসের অধিক কাল পর্যন্ত তাঁহাদের নিকট অবস্থানপূর্বক স্বগৃহ হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করলেন। তাহার দুই বৎসর পরে এক দিন নারদমুনি এসে সুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজন ! ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, গঙ্গা-দ্বারের নিকটে কোনও অরণ্যে যাজক-ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যে যজ্ঞ করে ছিলেন, তাঁহাদিগের কর্তৃক বনে নিক্ষিপ্ত সেই যজ্ঞাগ্নিতেই আপনার পিতৃব্য, পিতৃব্যপত্নী এবং মাতা-ঠাকুরাণী সদাতি লাভ করেছেন। সঞ্জয় মাত্র আত্মরক্ষা করে হিমালয়ে চলে গিয়েছেন।

[মহাভারত – আশ্রমবাসিকপর্ব, অধ্যায় ৩৭, শ্লোক ৩৩-৩৫]

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ-সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে কুন্তীদেবীর স্বপুরে মৃত্যু হওয়ার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে কোথা হতে কেমন করে আনা হলো, তাহা বুদ্ধির অগম্য। কুন্তীদেবী

শ্রীকৃষ্ণ বর্তমানেই পরলোক গমন করলেন বনবাসে অগ্নিতে, শ্রীমদ্ভাগবতে লিখলেন, কৃষ্ণের শোকে স্বপুরে। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ মহর্ষি-কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত নয়। শ্রীমদ্ভাগবতকার প্রকৃত ঘটনা মহাভারতে কি আছে, না আছে, তাহাও বোধ হয় জানতেন না এবং অনুসন্ধান করে দেখেন নাই।

তাঁহার পর শ্রীকৃষ্ণ যে কুন্তীর ভ্রাতৃনন্দন, তাহাও তাঁহার বিদিত ছিল না। যদি তাহাই থাকবে, তাহা হলে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে মন সমর্পণ পূর্বক কুন্তীদেবীর প্রাণ পরিত্যাগ করার কথা কখনই তিনি লিখতেন না কিংবা লিখতে শ্রীমদ্ভাগবতকারের সাহসেই কুলাত না। বস্তুত বাৎসল্য ভাবে যেরূপ সান্নিধ্য লাভ করা যায়, ভক্তিভাবে তত নয়। তবে যদি ভগবানের মাহাত্ম্য বিস্তার জন্য তিনি পিসির মন ভাইপোর পাদপদ্মে ঢালিয়ে থাকেন, তাহা হলে সে বিষয়ে কথা নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বিচিত্র কথা এই যে, দ্বারকা হতে প্রত্যাগত অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার পারিবারিক অবস্থা শুনতে অভিলাষী হয়ে, রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাকুলিত চিত্তে যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি সেই মূহুর্তে তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ উত্তর না দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে পাণ্ডবদিগকে অশেষ বিপদ হতে রক্ষা করেছেন, একটা একটা করে যুধিষ্ঠিরকে তাহাই শুনাতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির কিন্তু শুনতে চেয়েছেন যাঁহা তিনি ইতপূর্বে শুনেন নাই। অর্জুন যাহা বলা উচিত, তাহা না বলে যুধিষ্ঠির যে সব কাহিনি জ্ঞাত আছেন, সবিশেষরূপে তাঁহাকে তাহাই বলতে লাগলেন এবং তাহার পরিসমাপ্তির পর যদুকুলের ক্ষয় ও শ্রীকৃষ্ণের পরলোক-গমন সংবাদ জানালেন।

শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় প্রতাপে ও অপরিসীম সাহায্যে পাণ্ডবগণ যে সমস্ত বিপদ হতে রক্ষা পেয়েছেন ও যে সমস্ত ফল লাভ করেছেন, অর্জুনের গুরুজন ধর্ম-পরায়ণ যুধিষ্ঠির কি তাহা জানতেন না ? তাহলে অর্জুন অকৃতজ্ঞ মনে করে স্বমুখে কৃষ্ণকৃত উপকার বর্ণনাপূর্বক তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বন্ধ করবার প্রয়াস করলেন কেন ? বাস্তবিক অর্জুনের এ উদ্দেশ্য নিতান্তই অস্বাভাবিক। সুতরাং এই গ্রন্থ কদাপি ব্যাসকৃত হতে পারে না।

মহাভারতের মৌসলপর্বে আছে, ব্রহ্মশাপ হেতু মুষলপ্রভাবে যদুবংশ ধ্বংস হলে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের জন্য দূত প্রেরণ করে দেহ ত্যাগ করলেন। অর্জুন এসে সকলের শব-দাহাদি কর্ম-অন্তে যাবতীয় ধনরত্ন, মহিলাগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের একটি শিশু

পৌত্রকে সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুরে গমন করলেন। ***[প্রমাণঃ মহাভারত – মৌসলপর্ব, অধ্যায় ১,৭]*** অতপর (মহাপ্রাস্থানিকপর্বে) শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের সহিত মহাপ্রস্থানে সমুদ্যত হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পৌত্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের ও পরীক্ষিৎকে হস্তিনা নগরের অধীশ্বর নির্দেশ করে, যুযুৎসুর উপরে তাহাদের রাজ্যরক্ষার ভার, কৃপাচার্য্যের হস্তে ধনুর্বেদ শিক্ষার ভার এবং সুভদ্রার প্রতি শিশু দুইটির পরিরক্ষণ ভার সমর্পণ পূর্বক ভীমাদি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় ও দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থান করলেন। তাঁহারা হিমালয় পর্বত ছেড়ে যে সময়ে মহাশৈল সুমেরু-শিখরে উপস্থিত হচ্ছিলেন, তখন পাপ নিবন্ধন পড়তে পড়তে যোগভ্রষ্ট হয়ে সকলেই ভূতলে পড়ে গেলেন, মাত্র একাকী যুধিষ্ঠিরই জীবিত রইলেন। ***[প্রমাণঃ মহাভারত – মহাপ্রাস্থানিক পর্ব, অধ্যায় ১, শ্লোক ৬-১১]***

স্বর্গারোহণ পর্বে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় হতে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত —
উদ্ধব-বিদুর-সংবাদ

কুরু-পাণ্ডবদিগের সন্ধি-স্থাপনের নিমিত্ত বিদুর, অন্ধরাজকে যে সকল হিতকর বাক্য বলে ছিলেন, দুর্যোধন তাহা শুনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন এবং বিদুরের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাঁহাকে দেশ হতে তাড়িয়ে দিতে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। বিদুর পূর্বেই গৃহ হতে বের হয়ে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পর্যটনপূর্বক যে সমরে প্রভাস-তীর্থে উপস্থিত হলেন, তখনই তিনি জানতে পারলেন, যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সাহায্যে এই পৃথিবীকে একচক্রা, একচ্ছত্রা করে শাসন করছেন, কুরুগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ মানব-লীলা সংবরণ করেছেন; কৃষ্ণরূপ সূর্যের অস্তগমনে জগৎ অন্ধকার।

তাহার পর বিদুর উদ্ধবের নিকটে শুনলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্মরণ করে ছিলেন এবং মৈত্রেয় মুনির সমীপে গেলেই তিনি কৃষ্ণ বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করতে পারবেন। সেই উপদেশানুসারে কয়েক দিন ইতস্তত পরিভ্রমণের পর বিদুর ভাগীরথীর তীরে মৈত্রেয় মুনির নিকটে উপস্থিত হয়ে, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষান্ত হতে চতুর্থ স্কন্ধের শেষ পর্যন্ত পরম ভাগগত-তত্ত্ব যাহা কিছু আছে, সমস্তই শ্রবণ করে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করলেন।

এদিকে মহাভারতে দেখা যায়, বিদুর সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপস্যা-নিরত্ন, ধার্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়তম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। অন্ধরাজ তাঁহাকে চক্ষুস্বরূপ সতত নিকটে রাখতেন, মুহূর্তের জন্য তিনি কাছে না থাকলে দিশাহারা হয়ে যেতেন। ইহা উদ্যোগপর্বে, কর্ণপর্বে ও শল্যপর্বে বিশিষ্টরূপে লিখিত রয়েছে। বিদুরের সত্যের বল এত ছিল যে, দুর্যোধন কখনই তাঁহাকে অতিক্রম করতে পারেন নাই। বনপর্বের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত রয়েছে, পাণ্ডবগণের সপক্ষ বলে ধৃতরাষ্ট্র একবার বিদুরকে পরিত্যাগ করাতে তিনি বনে গিয়ে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই এই ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ-জ্বালা ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল, তিনি ভ্রাতার জন্য শোক করতে করতে অচৈতন্য হয়ে ভূমিতে নিপতিত হলেন এবং কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করে সঞ্জয়কে বললেন, সঞ্জয় ! আমি ভ্রাতৃবিরহে কোন ক্রমে প্রাণ-ধারণ করতে সমর্থ হচ্ছি না; তুমি সত্বর গিয়ে বিদুরকে আনয়ন কর। নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করব। অতঃপর সঞ্জয় কর্তৃক বিদুর

আনীত হলে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে বুকে ধারণ করে বলতে লাগলেন, হে অনঘ ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার যাবতীয় তিরস্কার-বাক্য বিস্মৃত হও, ইত্যাদি।

ইহার পরে অন্ধরাজ আর কখনই বিদুরকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। ধৃতরাষ্ট্র বর্তমান সত্ত্বেও বিদুর দুর্যোধনকে কিছুমাত্র ভয় করতেন না, দুর্যোধন কস্মিনকালেও সর্বস্ব কেড়ে এনে বিদুরকে দূর করে দেওয়ার মন্ত্রণা করেন নাই এবং বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পরিত্যাগ করে কোন দিনও কোন তীর্থে যান নাই।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্বে বিদুর অন্ধরাজকে বহুবিধ হিতোপদেশ প্রদান করেছেন। অন্ধরাজের নিকটে বিদুরের অতি-উচ্চতর প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং দুর্যোধনের কি ক্ষমতা ছিল যে, তিনি বিদুরকে তাড়িয়ে দেওয়ার কথা মুখে আনতে পারেন ? সন্ধি করার অভিপ্রায়ে মহাত্মা কেশব পাণ্ডবদিগের অবলম্বন পূর্বক যে সময়ে হস্তিনায় এসে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে উপস্থিত হন, তখন দুর্মতি দুর্যোধন তাঁহাকে সহায়হীন বিবেচনা করে বন্ধন করতে মন্ত্রণা করে ছিলেন। কিন্তু বিদুর সেই দুরভিসন্ধি জানতে পেরে অন্ধরাজের নিকট ব্যক্ত করাতে, তিনি তাঁহাকে সভায় আনার জন্য বিদুরকেই অনুমতি করলেন। তদনুসারে, দুর্যোধনের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিদুর এনে তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত করেন। অতঃপর অন্ধরাজ, বিদুর এবং শ্রীকৃষ্ণ, দুর্যোধনকে কি কি কথা বলেছেন, পাঠকদিগের জন্য অতি সংক্ষেপে তাহা উদ্ধৃত করতেছি। ইহাই কিন্তু সন্ধির প্রস্তাবের শেষ কথা। মহাত্মা বাসুদেব সন্ধি করতে অকৃতকার্য্য হওয়াতেই যুদ্ধারম্ভ হয়।

উদ্যোগপর্বের অধ্যায় ১২৯-১৩১ পর্যন্ত —

বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিদুর অনিচ্ছু হলেও দুর্যোধনকে পুনরায় সভাগৃহে আনয়ন করলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ, দুঃশাসন ও দুর্বৃত্ত ভূপালবর্গে পরিবেষ্টিত সেই দুরাশর দুর্যোধনকে বলতে লাগলেন, রে পাপাত্মন্ ! রে ক্রুরমতে ! তুমি নীচ-কর্মানুষ্ঠান-নিরত সহায়গণের সহিত মিলিত হয়ে নিদারুণ পাপকর্ম করতে ইচ্ছা করেছ ? রে পাপিন ! শুনলাম, নরাধমগণের সাহায্যে তুমি নাকি দুর্দ্ধর্ব বাসুদেবকে নিগৃহীত করতে সমুদ্যত হয়েছ ? ইত্যাদি গালাগালি ও ভৎসনা।

অনন্তর মহামতি বিদুর রোষপরায়ণ দুর্যোধনকে বললেন, হে ভরতর্ষভ ! যে বাসুদেব বাল্যাবস্থাতেই পুতনা রাক্ষসী প্রভৃতিকে বিনষ্ট করেছেন, যৌবনে যাঁহার হস্তে, কংস,

জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণ পরাজিত হয়েছেন, তুমি সেই অস্মিতবিক্রম বাসুদেবকে এপর্যন্ত জানতে পারলে না ? ক্রুদ্ধভুজঙ্গোপম প্রচণ্ড তেজোরাশি অনিন্দিতাত্মা কৃষ্ণকে গ্রহণ করার আশয়ে তাঁহার সমীপস্থ হলে, প্রদীপ্ত অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের ন্যায় তোমাকে অমাত্যগণের সহিত প্রাণত্যাগ করতে হবে।

বাসুদেব বললেন, হে দুর্যোধন ! তুমি বিবেচনা করেছ আমার সঙ্গে কেউ নেই ? কিন্তু তুমি দেখ ! এই কথা বলেই তিনি তাঁহার শবীর হতে ইন্দ্রাদি দেবতা, যদু ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ এবং অর্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবদিগকে সশস্ত্র বহির্গত করলেন; নিজেও বিশ্বমূর্তি ধরলেন। তা দেখে দুর্যোধনাদি ভয়ে মহাভীত ও স্তম্ভিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে ঐ সময়ের জন্য চক্ষু লাভ করে, অন্ধরাজও তাঁহার বিশ্বমূর্তি দর্শনে কৃত-কৃতার্থ হলেন এবং বহুপ্রকারে স্তব করতে লাগলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও কৃতবর্মার হস্ত ধারণপূর্বক বহির্গত হয়ে, অন্তপুরে কুন্তীদেবীর নিকট গমন করলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণে পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে আদেশ দিলেন।

এ দিকে দুর্যোধনেরা কুরুক্ষেত্রে শিবির সংস্থাপনপূর্বক তথায় গমন করলেন; মহামতি বিদুর ও সঞ্জয়, অন্ধরাজের নিকটেই অবস্থান করলেন। সঞ্জয় কখনো কখনো সমরদর্শনে যেতেন ও এসে তাহা অন্ধরাজের নিকটে বিশেষরূপে বর্ণন করতেন বটে, কিন্তু বিদুর আর কোথাও গমনই করতেন না।

যুদ্ধের কাল, — ভীষ্মদেবের দশ দিন, দ্রোণাচার্যের পাঁচ দিন এবং কর্ণের মাত্র এক দিন। এই এক দিনেয় যুদ্ধেই কর্ণের নিধনবার্তা শ্রবণে, শোক সন্তপ্ত-হৃদয়ে অন্ধরাজ ধরাতলে নিপতিত হলেন, বিদুর গিয়ে তাঁহাকে অনন্ত প্রকারে প্রবোধবাক্যে বুঝাতে লাগলেন। তাহার পর (শল্যপর্বে) দুর্যোধনাদির বিনাশ-সংবাদ শুনেও শোকার্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভূতলশায়ী হলে, শোকশান্তি জন্য তাঁহাকে প্রবোধ দেওয়া ও তাঁহার সেবা-শুশ্রূষাদি-কর্মে নিয়ত ব্রতী হওয়া বিদুরের কার্য হলো। ইহার পর বিদুর, অন্ধরাজকে ফেলে এক মুহূর্তের জন্যেও স্থানান্তর গমন করেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে অন্ধরাজ পনেরো বৎসর কাল স্বগৃহে ছিলেন, মহাত্মা বিদুর তাঁহার নিকটেই ছিলেন; অতপরে তিনি যখন বন গমন করলেন, তখনও গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয়সহ বিদুর তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী। এই বন মধ্যেই, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ যে সময়ে পিতৃব্যপ্রভৃতির দর্শনে গিয়ে ছিলেন, সেই সময়ে যুধিষ্ঠিরের সমক্ষেই বিদুর দেহত্যাগ

করেন। তবে তিনি কীভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে বা পরে, অন্ধরাজকে পরিত্যাগ করে পৃথিবী ও তীর্থপর্যটনে গেলেন কখন ? তাহার পর বিদুরের মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বর্তমান ছিলেন। এ অবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবতকার কেমন করে লিখলেন যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে বিদুর পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থ পর্যটন পূর্বক, যে সময়ে পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করতে ছিলেন, যে সময়ে কৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছেন, সেই সময়ে তিনি প্রভাসে এসে উপস্থিত হলেন এবং উদ্ধবের নিকটে মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিসংবাদ ও মৈত্রেয় মুনির সমীপে গিয়ে ভাগবত তত্ত্ব শ্রবণের উপদেশ শুনতে পেলেন ? কেবল উপদেশ পেয়েই বিরত হলেন না; দীর্ঘকাল বসে শুনলেন।

পাঠক ! বিবেচনা করে দেখুন — শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান থাকতে, বনবাসে মহাভারতের বিদুরের মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর, সেই বিদুর পৃথিবী ও তীর্থ পর্যটন করে, প্রভাসে উপস্থিত হয়ে ও উদ্ধবের নিকট ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত কেমন করে শুনতে পারেন ! মৈত্রেয় মুনি কর্তৃকই বা তাঁহার নিকট ভাগবতের ঐ তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায় হতে চতুর্থ স্কন্ধের শেষ পর্যন্ত কীরূপে কথিত হতে পারে ? বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের পার্থিব লীলা-খেলার সময়ই যে বিদুর পরলোকগত হলেন, পুনরপি কৃষ্ণতিরোধানের পর কীরূপে সেই মৃত বিদুর আবার উদ্ধব ও মৈত্রেয় মুনির নিকটে গিয়ে ছিলেন ? অতএব এই মুখ্য প্রমাণে নিঃসংশয়িত্বরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঐ তৃতীয় স্কন্ধের প্রথম হতে চতুর্থ স্কন্ধের শেষ পর্যন্ত কাল্পনিক ও কৃত্রিম।

শ্রীমদ্ভাগবত খানি একেই তো মূলহীন বৃক্ষ; তাহাতে আবার গ্রন্থকার তাহার শাখায়-প্রশাখায় দিয়েছেন মরা-মানুষ বেঁচে ওঠে ঘোরে। এরূপ গ্রন্থ মহাভারত গ্রন্থকার পণ্ডিত-চূড়ামণি মহর্ষি বেদব্যাসের নামে কৃত্রিম না করে, শ্রীমদ্ভাগবতকারের স্বীয় নাম প্রকাশ করাই উচিত ছিল। তিনি জগৎপূজ্য মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম কলঙ্কিত করতে অহেতুক প্রয়াস করলেন কেন ?

≈≈

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ে —
পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্ম-শাপ এবং শুকদেবের আগমন

একদা রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়াকালে ধ্যান-পরায়ণ তপস্যা নিমগ্ন শমীক নামে কোনো এক মুনির গলায় একটা মৃত সর্প তুলে দিয়ে তাঁহার অপমান করেন। তৎ দর্শনে তৎপুত্র ক্রোধ-পরবশ হয়ে, সপ্তাহ-মধ্যে তক্ষক নামক সর্পে দংশন করবে বলে পরীক্ষিৎকে অভিসাপ দেন। তখন মুনিবরের ধ্যান-ভঙ্গ হওয়াতে, তিনি ঐ সংবাদ শিষ্য দ্বারা রাজা পরীক্ষিতের নিকট প্রেরণ করলেন। পরীক্ষিৎ তাহা শুনে পুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক গঙ্গাতীরে গমন করলেন এবং তথায় গিয়ে কুশ শয্যায় আসীন হলেন। এমন সময়ে নারদ, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ সেখানে উপনীত হলে, রাজা তাঁহাদিগকে অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করলেন যে, অন্তিম সময় নিকটবর্তী হলে, মানুষের কী করা কর্তব্য ? তদুত্তরে কেহ বললেন যজ্ঞ, কেহ বললেন দান, ইত্যাদি। এইরূপ তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে, এমনকালে শুকদেব এসে উপস্থিত হলেন এবং রাজার জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগত হয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলতে আরম্ভ করলেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় হতে মূল-সূত্র অবলম্বন করে সূত শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে অবশিষ্ট সমস্ত গ্রন্থের পরিসমাপ্ত করেছেন। ইহারই নাম শ্রীমদ্ভাগবত; অর্থাৎ গঙ্গাতীরে বসে রাজা পরীক্ষিৎ গুরুমুখে যে ভাগবততত্ত্ব শ্রবণ করে ছিলেন, আনুপূর্বিক তাহাই সূত, শৌনকাদি ঋষিগণ সমীপে বলেছেন।

[ভাগবত – প্রথম স্কন্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ২৪-৩৭]

এ বিষয়ে এই প্রস্তাব মহাভারতেরও মূল-সূত্র, তা আবার শ্রীমদ্ভাগবতেরও মূল-সূত্র হয়েছে। শমীক নন্দনের ক্রোধের কারণ, শাপ দেওয়া এবং পরীক্ষিৎকে সংবাদ প্রদান করা পর্যন্ত উভয় গ্রন্থে প্রায় একরূপ। কিন্তু মহাভারতে দেখা যায়, শাপ প্রাপ্ত হয়ে পরীক্ষিৎ কখনই অপোগণ্ড শিশু পুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে গঙ্গাতীরে চলে যান নাই, ঐ সময়ে নারদাদি মুনিগণ ও ব্যাসনন্দন শুক, সপ্তদিন মধ্যে তাঁহার নিকটে সমাগত হন নাই। তাহাতে লিখিত রয়েছে, রাজা পরীক্ষিৎ শমীকপুত্রের ক্রোধের কারণ ও শাপের বৃত্তান্ত শুনে অত্যন্ত লজ্জিত ও প্রাণভয়ে ব্যাকুন্তিত হলেন। তাহাঁর পর তিনি স্বকীয় প্রাসাদের উপরেই একটা সুরম্য-স্তম্ভ নির্মাণ করিয়ে উপযুক্ত প্রহরীর হস্তে রক্ষণ-ভার সমর্পণ-পূর্বক, মন্ত্রিগণ ব্রাহ্মণগণ, কতিপয় ওঝা, বৈদ্য ও বহুপ্রকার ওষধি সমভিব্যাহারে তাহাতে বাস করতে লাগলেন এবং তথা হতেই

রাজকার্য চালাতে আরম্ভ করলেন। প্রাণ-ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য ঔষধ-পত্র সহ বৈদ্য, ওঝা, মন্ত্রী এবং ব্রাহ্মণে পরিবেষ্টিত হয়ে, সতর্ক ও সাবধানতার সহিত স্বভবনস্থ স্তম্ভমধ্যে লুকায়িত থাকলেন। কালের গতি সর্বত্র অপ্রতিহত; তাই অব্যর্থ ব্রহ্মশাপের প্রভাবে, সপ্তম দিবসে ছলে কৌশলে তক্ষক তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে তাঁহাকে দংশন করল, সেই দংশনেই রাজা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলেন।

অতঃপর রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হলে, মন্ত্রিগণ প্রজাদিগের সহিত পরামর্শপূর্বক শিশু রাজপুত্র জনমেজয়কে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ-কার্য চালাতে লাগলেন। ঐ শিশু ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, উতঙ্ক মুনির নিকট তাঁহার পিতার নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করে, মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা রাজা পরীক্ষিৎ যেরূপে অভিশপ্ত হয়ে ছিলেন, যেরূপ সাবধানে আত্মরক্ষা করে ছিলেন এবং কশ্যপ নামক ওঝার যেরূপ ক্ষমতা দর্শনে তক্ষক তাঁহাকে বহুমূল্য রত্নাদি উৎকোচদানে রাস্তা হতে ফিরিয়া দিয়ে ছলে কৌশলে রাজার সন্নিধানে প্রবেশ পূর্বক রাজাকে দংশন ও নষ্ট করে ছিল, তৎসমুদয় বিবরণ আনুপূর্বিক বললেন। তা শুনে জনমেজয় শোকে ও ক্রোধে অভিভূত হয়ে রোদন করতে লাগলেন এবং ক্রোধবশে বললেন, পিতা পিতৃঘাতী তক্ষকের কি অনিষ্ট করে ছিলেন যে, সে কশ্যপ নামক ওঝাঁকে ধন দ্বারা বশীভূত করেই ফিরিয়ে দিয়ে, বিষজালে পিতাকে দগ্ধ করেছে ? তক্ষক যদি ধন দ্বারা কশ্যপকে বাধা না করত, তাহা হলে নিশ্চয়ই আমার পিতা জীবিত থাকতেন। রাজপুত্র এইরূপ বিলাপ করে, কীরূপে পিতৃঘাতী তক্ষকের বিনাশ হতে পারে, তাহারই উপায় চিন্তা করতে লাগলেন এবং মন্ত্রিগণসহ মন্ত্রণাপূর্বক সর্পসত্র নামক যজ্ঞের আয়োজন ও যথাসময়ে যজ্ঞ আরম্ভ করে দিলেন,,, ইত্যাদি।

[মহাভারত – আদিপর্ব, অধ্যায় ৩৪-৫১]

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ও মৃত্যু সময়ে জনমেজয় এমন শিশু ছিলেন যে, কী প্রকারে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়ে ছিল, তাহাও তিনি জানতে পারেন নাই। এই অবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, তাঁহার উপরে পরীক্ষিৎ রাজকার্যের অত বড় গুরুতর ভার অর্পণ করলেন, ইহা সম্ভব কীভাবে ? তাহার পর পরীক্ষিতের মৃত্যু স্বভবনে প্রাসাদের উপরে-স্তম্ভ মধ্যে। শ্রীমদ্ভাগবতের লেখানুরূপ তিনি গঙ্গা-তীরেও যান নাই, শুকদেবকেও পান নাই এবং শুকের মুখে তাঁহার নিকটে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা আরম্ভ ও পরিসমাপ্তও হয় নাই। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের মূলসূত্র হতে আগাগোড়া সমস্তই যে কাল্পনিক এবং এরূপ কাল্পনিক গ্রন্থ কখনও যে মহাভারতকার ব্যাসদেব কৃত হতে পারে না, ইহা পরিষ্কার রূপে প্রমাণ হচ্ছে।

≈≈

এছাড়াও বিস্তারিত বিবরণ জানতে মহাভারতে আদি পর্বের চত্বারিংশ অধ্যায় হতে একপঞ্চাশ অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে তা পাঠ করবেন।

— ✰ —

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মহাভারতের অনেক প্রসঙ্গই পুরাণে শুনেছি বলে বহু কথা দৃষ্টান্ত ও প্রমাণস্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং মহাভারত সৃষ্টির পূর্বেও যে পুরাণ ছিল, তাহার আর ভুল-ভ্রান্তি নাই। তবে উহা গ্রন্থাকারে ছিল, কি মুখে মুখে ছিল, তদ্বিষয়ক প্রমাণ অভাব। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত সেই পুরাণশ্রেণীতে পরিগণিত হওয়ার কথা নয়; কেননা, উহা নামে-মাত্র পৃথক, বস্তুত উহাতে যে সকল প্রস্তাব উদ্ধৃত হয়েছে, তাহার অধিকাংশই মহাভারত ও মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের গ্রন্থকার, সেই সমস্ত খাঁটি জিনিসে কতকগুলি কাল্পনিক ও অসম্ভব কথা জড়িয়ে, শ্রীমদ্ভাগবত নামে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থের অবতারণা করেছেন। তাহার পর শ্রীমদ্ভাগবতের মূল উদ্দেশ্যেও লিখিত রয়েছে, মহাভারতাদি গ্রন্থের পরেই দেবর্ষি নারদের উপদেশ ক্রমে এই গ্রন্থ রচিত। সুতরাং মহাভারতের উল্লিখিত পুরাণ মধ্যে, শ্রীমদ্ভাগবত কদাপি স্থান পেতে পারে না।

[প্রমাণঃ ভাবার্থ~ শ্রীমদ্ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়]

এই শ্রীমদ্ভাগবত মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের কৃত তো নয়ই, তাহার পর ইহা অন্য কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য, এই তিন জাতীয় কোন ব্যক্তিরও হস্তলিখিত বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে না। ইহার বিশুদ্ধ প্রমাণ ঐ গ্রন্থেই সন্নিবিষ্ট রয়েছে। পূর্বে ব্রাহ্মণাদি তিন জাতি ভিন্ন, অন্য কোন বর্ণেরই বেদ পাঠে অধিকার ছিল না; সুতরাং বেদ এবং বেদোক্ত সন্ধ্যা-বন্দনাদি তাঁহাদিগেরই বিদিত ছিল। এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতকার স্বকীয় গ্রন্থে বেদ পরম গুহ্য বলে স্থির করেছেন। বেদ-অধ্যয়নে যে সকলের অধিকার ছিল না ইহা মনুসংহিতা ও মহাভারতাদি পুরাণ গ্রন্থে লিখিত আছে।

বেদ যে কিম্ভুত-কিমাকার তাহা বোধ হয় শ্রীমদ্ভাগবতকার কোন অংশেও জ্ঞাত ছিলেন না। তাই তিনি তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে, প্রথম বারে চারবেদ বের করেছেন — জাগ্রত ব্রহ্মার মুখ হতে, ***[প্রমাণঃ ভাগবত – তৃতীয় স্কন্ধ, দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৩৭]***। অষ্টম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিতীয় বারে উহার বহির্গমন লিখেছেন — বিষ্ণুর দেহগত ছিদ্র হতে, ***[প্রমাণঃ ভাগবত –অষ্টম স্কন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়, শ্লোক ৩৯]***। এবং অষ্টম স্কন্ধের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে মৎস্যচরিতে চতুর্থ বারে সেই বেদের সৃষ্টি বলেছেন — নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ হতে, ***[প্রমাণঃ ভাগবত – অষ্টম স্কন্ধ, চতুর্বিংশ অধ্যায়, শ্লোক ৫]*** । ঘুমন্ত ব্রহ্মার মুখে জন্মেই বেদ নিষ্কৃতি পেতে পারে নাই; জন্মমাত্রেই হয়গ্রীব নামে দৈত্য উহা নিয়ে চম্পট দিল। শেষে বিষ্ণু, সেই দৈত্যকে বধ

করে বেদের উদ্ধার করলেন। এই সকল কথা কি বেদব্যাসের বলে সম্ভবে ? বেদ কি পদার্থ, উহাকে চম্পট করল এবং কীরূপে উহার উৎপত্তি হলো, তিনি কি তাহা জানতেন না ? শ্রীমদ্ভাগবতকার বেদকে কতকগুলি বহুমূল্য রত্ন বলে স্থির করেছেন; তাই তিনি উহা কখনও অনিদ্রিত ও নিদ্রিত অবস্থায় ব্রহ্মার মুখ হতে বের হওয়ার কথা এবং কখনও বিষ্ণুর দেহগত ছিদ্র ও মুখ হতে সৃষ্ট হওয়ার কথা বলেছেন। সুতরাং এতদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতকার যে বেদ কখনই দেখেন নাই, বা শুনেন নাই, তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের কোনও ব্যক্তি নহেন এবং বেদ অধ্যয়নে কিংবা শ্রবণে তাঁহার যে অধিকার ছিল না তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত লক্ষণে বোধ হয়, তিনি নিচু জাতীয়, বা বর্ণসঙ্কর-মধ্যগত সংস্কৃত অজ্ঞ কোনো পণ্ডিত ছিলেন। তবে কী উদ্দেশ্যে, কী স্বার্থে, তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবত খানি মহাত্মা ব্যাসদেবের নামে কৃত্রিম করা হয়েছে, এক্ষণে ইহাই বিচার্য এবং তাহাতে যে তাঁহার ষোল আনা স্বার্থ ছিল, তাহাই পাঠকদিগকে দেখানো হচ্ছে।

ব্যাসকৃত মহাভারত এবং মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হতে দেহত্যাগ পর্যন্ত সমস্ত বিবরণই লিখিত আছে। তাহাতে জানা যায়, মনুষ্যদেহে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতৃস্বসা প্রভৃতি নমস্যবর্গের যেরূপ সম্মান ও অভিবাদন করা আবশ্যক, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তদনুরূপ ব্যবহার করতেন। কী লৌকিক, কী নৈতিক, কোন বিষয়েই তাঁহার কোন অভাব বা রীতি-ব্যতিক্রম ছিল না; ঐ দুই গ্রন্থের কৃষ্ণচরিত মহৎ হতেও মহৎ। তিনি বাল্যে ও কিশোর বয়সে বৃন্দাবনে যে সকল কর্ম করেছেন, তাহা হরিবংশে এবং মথুরায় দ্বারকায় যাহা যাহা করেছেন, তাহাও মহাভারতে হরিবংশে বিস্তারিত রূপে রচিত হয়েছে। মূল কথা, কথিত গ্রন্থদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের কোন কর্মই লিখতে বাকী নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রণেতা সেই সমস্ত কর্মগুলি রূপান্তরে লিখে, ব্যাসদেবের কীর্তি ধ্বংস করেছেন এবং মহাভারতে হরিবংশে বাকী ছিল মাত্র কৃষ্ণের দুশ্চরিত্রতা; তাঁহাই তিনি নতুন দেখিয়েছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বাসুদেব পবিত্রচরিত্র, সাধুগণের অগ্রগণ্য, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, সুপণ্ডিত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক, ক্ষত্রিয় বীরগণের অজেয়, অদ্বিতীয় বীর, ধর্মরক্ষক, ধর্মপোষক, ধর্মপ্রবর্তক, দুষ্ট-সংহারক এবং সদাচারনিরত্ব। এই সকল সদগুণ ও কার্যগত মাহাত্ম্য দর্শনেই লোকে তাঁহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বর বলপ জ্ঞান করেছে। তদ্ভিন্ন তিনি কদাপি চতুর্ভুজমূর্তি ধারণ করে যেখানে-সেখানে উপস্থিত হন নাই, ঈশ্বররূপে অথবা ঐশ্বরিক শক্তি ক্রমেও কোন কর্ম করেন নাই; যে সমস্ত মহৎ কর্ম করেছেন, সকলই মানব রূপে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে, তিনি যখন যে

যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন, তখন সেই জাতীয় আচার ব্যবহার ও ধর্ম সমস্তই অবলম্বন করে থাকেন। রাম অবতারে পিতৃ-সত্য-পালন জন্য চতুর্দশ বর্ষ পর্যন্ত বনবাস-জনিত অনন্ত ক্লেশ সহ্য করাই তাহার অন্যতর প্রমাণ।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ইহার বিপরীত। তাহাতে ঈশ্বরত্ব প্রদর্শন জন্য কৃষ্ণ পিতৃব্য অক্রূরের ও পিতৃষ্বসা কুন্তী দেবীর প্রণাম পর্যন্ত গ্রহণ করে প্রীত হয়েছেন; কেবল প্রণাম নেওয়াই বর্জিত ছিলেন মাতাপিতার। কিন্তু তাঁহারা যে সম্পূর্ণরূপে প্রণামের দায় হতে নির্মুক্ত হয়ে থাকতে পেরেছেন, তাহাও নহে; যে প্রণামটা দেওয়া নেওয়া হয়েছে অন্তরে অন্তরে। মাতা-পিতার প্রকাশ্য প্রণামটা যদি দোষাবহ হলো, তবে পিতৃব্য পিতৃভগ্নী যে তৎ তুল্য পূজ্য, তাঁহাদের প্রণামের ব্যবস্থা হয়েছে কীরূপে ? ঈশ্বরত্ব দেখানো যদি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য হতো, তাহা হলে তিনি কখনই মানব যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করতেন না। বাসুদেবের উপর তাহার পিতা মাতার যে ভালবাসা ও স্নেহ ব্যাসদেব তা মহাভারতে, হরিবংশে ভক্তির উচ্চ-সীমায় তুলেছেন, শ্রীমদ্ভাগবতকার তাহা একবারেই উড়িয়ে দিয়ে, শুদ্ধ প্রণাম দ্বারাই শ্রেষ্ঠ ভক্তি দেখিছেন। তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রণামটা যে তাঁহার গ্রন্থে নাই, এমন নয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কৃষ্ণের যদি ঈশ্বরত্ব দেখিয়ে লোক ভুলানোর ইচ্ছা থাকবে, তাহলে তিনি গর্ভ-নরকের অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করলেন কেন ? বৈকুণ্ঠ হতে চতুর্ভুজ মূর্তিতে এসে গোপদিগের সর্বনাশ করে গোপ-শিশুদিগের মস্তকে বজ্রাঘাত করে গোপ-রমণীদিগকে বাহির করে নিলে কি হতো না ? তিনি দেবমূর্তিতে কি কুঞ্জার কুজ সোজা করতে পারতেন না ? তাঁহার যদি লাম্পট্য, শঠতা, ধূর্ত্ততা, চৌর্য্য, দুশ্চরিত্রতা, লোকপীড়কতা, অত্যাচারিতা, মূর্খতা, অধার্মিকতা এবং পরস্ত্রী অপহারকতাদি অমার্জনীয় বিবিধ দোষ থাকবে, তিনি যদি কটাক্ষ সন্ধানে বা সঙ্গীত-চাতুর্যে সহস্র সহস্র গোপললনাকে মোহিত করে স্বামী গৃহ ও শিশু-সন্তান পরিত্যাগে বনগামিনী করতেন, তবে কি বিপন্ন অসন্মানিত গোপ-সম্প্রদায় তাহার কোনই প্রতিবিধান না করে নীরবে বসপ থাকত ? লোক-প্রকৃতিতে, ইহা কদাপি সম্ভবপর হতে পারে না। কথা সত্য হলে, গোপগণ নিশ্চয়ই বাসুদেবকে তাহার প্রতিশোধ দিত, অমন দুশ্চরিত্রা কুলনাশিনী অবলাদিগের প্রাণাত্যয় ঘটাত এবং বোধ হয় গোপের বেটা নন্দের জীবন নিয়েও টানাটানি না করে ছাড়ত না। এরূপ জঘন্য কর্মে প্রবৃত্ত ঈশ্বর কেন, ঈশ্বরের বাবা হলেও তাহাকে কেউ রেগাই করতো না; নিতান্ত অপারত পক্ষে আত্মপ্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়।

শ্রীকৃষ্ণের গীতে উন্মত্তা গোপাঙ্গনাগণ, স্তন্যপান-নিরত শিশুদিগকেও পরিত্যাগপূর্বক বনে গমন করে তাঁহাদের আদরের ধন কৃষ্ণকে পেল এবং পরিত্যক্ত শিশুগুলি কেঁদে কেঁদে চতুর্দিক কম্পিত করল। শ্রীমদ্ভাগবতকার তাঁহার গ্রন্থে এখানি লিখেছেন সত্য, কিন্তু অতঃপর মাতৃহীন শিশুদিগের কি দশা ঘটল, তাহারা জীবিত রহিল, না মাতৃবিরহে মরে গেল; গৃহশূন্য গোপদিগের অবস্থাই বা কীরূপ দাঁড়াল, তাহারা ঐরূপ অসহ্য দুঃখে ও কষ্টে মাথা কুটিতে কুটিতে শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে মরল, কি লাঠি নিয়ে প্রতিবারের চেষ্টা পেল, না জন্মের মত স্ব স্ব পত্নীদিগকে উৎসর্গ করে দিল; তাহার তিনি কোন কথাতেই হাত দেন নাই, কোন কথারই কিছু কিনারা করে লিখেন নাই। তাঁহার যে পর্যন্ত স্বার্থ, সেই পর্যন্তই রচনা। সুতরাং এমন স্বার্থপর রচকের রচনা কোনও ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। অতএব এই সকল অপবাদ কাহিনি নিতান্ত অলীক ও অপ্রাসঙ্গিক। ভগবানের পবিত্র চরিত্রে এই অমূলক কলঙ্ক বিবরণ পাঠ, শ্রবণ বা বিশ্বাস করলেও নিশ্চয় তাহাকে মহাপাতকে পতত হতে হবে।

অক্রুর এসে যেই বললেন, শ্রীকৃষ্ণ তখনই মথুরায় গমন করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি

কুঞ্জার কুজ সোজা করে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেবের সমক্ষেই তাহার সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে মত্ত হলেন, তৎপরে তাহাঁর অনুমতি গ্রহণে ঘর হতে বের হয়ে পিতৃ ভবনের নিকটে গিয়েই আবার পুরনারীদিগের প্রতি কটাক্ষ করতে লাগলেন; তাহাতে সমস্ত পুরনারী মোহিত হয়ে পড়ল। যে লজ্জা মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ মহৎ গুণ বলে ব্যাখ্যাত, যাহার অভাবে লোক পাগল, শিশু অথবা মাদকাসক্ত (নেশাখোর) বলে উপহাসিত হয় এবং যাহার কল্যাণে মনুষ্য-সমাজ পরিরক্ষিত হচ্ছে, কৃষ্ণের মত একজন উন্নতচেতা বীরপুরুষ, সেই লজ্জাকে তৃণবৎ উড়িয়ে দিয়ে, গুরুজন বলদেবের সাক্ষাতেই কুঞ্জাতে উপগত হলেন ও পুরনারীদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করলেন ! লাজের মাথা খেয়ে শ্রীমদ্ভাগবতকার কোন প্রাণে এমন অন্যায়, অসঙ্গত, অসম্ভব কথাগুলি লিখলেন ? অনেকদিন পরে কৃষ্ণ বলরাম দর্শন জন্য যখন পুরনারীরা বাহির হয়ে ছিল, তখন কি তাহার মধ্যে কৃষ্ণের ভগ্নী, মাতুলানী, পিতৃব্যপত্নী প্রভৃতি কোন গুরুলোক ছিলেন না ? বিশেষত নিগড়-নিবন্ধ মাতাপিতার উদ্ধার-বাসনায় দুষ্টু দুর্মতি কংস বিনাশ জন্য যিনি মথুরায় উপস্থিত হয়েছেন, তাঁহার কি এই কুব্যবহার সম্ভব ?

কৃষ্ণ-বলরাম যেতে যেতে পথিমধ্যে দেখলেন, কংসের ভৃত্য রজক, তাঁহার পুরাতন বস্ত্রগুলি ধৌত করে রাজভবনে নিয়ে যাচ্ছে। তখনই তাঁহাদের লোভ জন্মিল; রজক সহজে বস্ত্র না দেওয়াতে, কৃষ্ণ নিজে তাহাকে হত্যা করে দুই ভাই বস্ত্র পরিধান করলেন। শ্রীমদ্ভাগবত লেখক যাঁহাকে শত শত স্থানে স্বয়ং ঈশ্বর বলে বর্ণনা করেছেন, সুতরাং যে বিশ্বরূপের কোন বস্তুরই অভাব সম্ভব না, সেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাই আবার লোভবশে উৎসৃষ্ট পুরাতন বস্ত্র গ্রহণ ও নিরপরাধে একটি প্রাণী বধ করালেন ? তাঁহার এ লিপি বৈচিত্র্য বস্তুতঃ বিস্ময়কর।

শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণের উপর গুরুতর দোষ চাপিয়ে দিয়ে তাঁহার নাম দিয়েছেন কোথাও আত্মারাম, কোথাও রমানাথ, কোথাও জগৎস্বামী। আত্মরূপী নারায়ণ, এই বলে যদি তিনি তাঁহাকে আত্মারাম লিখে থাকেন, তাহলে আত্মরূপী ঈশ্বর, আর পিতা, একই কথা তবে তাঁহার কলমে কেমন করে লিখিত হলো যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপ রমণীদিগকে দেখে আত্মভোগে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে, ইতর-জনোচিত মনোমুগ্ধকারী সঙ্গিতে টান দিলেন। সেই মুহূর্তেই গোপীরা সেই গানে উন্মত্ত হয়ে, কৃষ্ণকে বাবা না বলে, আত্মারাম নামে সম্বোধন করল !

মহাভারতে হরিবংশে, শ্রীকৃষ্ণ যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে যদিও উহা সোজাসুজি ভাবে লিখিত না

থাকুক, তবুও গ্রন্থকার যখন শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব দেখাতে গিয়েছেন, তখনই তাঁহাকে ত্রিকালজ্ঞ বলে স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং তিনি যে ক্ষত্রিয়, তাঁহার মাতাপিতা যে কংসের অত্যাচারে কারারুদ্ধ ছিলেন, তাঁহাকে যে অনতিবিলম্বেই বৃন্দাবন পরিত্যাগপূর্বক পিতৃভবনে যেতে হবে এবং উপনীত হয়ে পত্নী গ্রহণ করতে হবে, ইহা অবশ্যই তিনি জানতেন, মাতাপিতার গুরুতর কষ্টের কথাও অবশ্যই মনে করতেন। তাহার পর গোপ রমণীরা যে গোপদিগের উৎসৃষ্ট, তাঁহার সৃষ্টিতে যে তদপেক্ষা সহস্রগুণে সুন্দরী স্ত্রীর অভাব ছিল না, অর্থবা সৃষ্টি করে নিতেও তিনি অক্ষম ছিলেন না, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের অবগতি ছিল। এ অবস্থায় তিনি মুহূর্তের জন্য জ্ঞানান্ধ হয়ে অতবড় দুষ্কার্য ও দস্যুতা করেছিলেন, ইহা একান্ত অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ কি নৈতিক উদ্দেশ্যে গোপীদিগকে ঘরের বাহির করে, পরে ঝোপে জঙ্গলে ফেলে প্রস্থান করে ছিলেন ? গোপীরা তাঁহার কি অনিষ্ট করেই ছিল ? তবে কদাচিৎ কোনও নরপশু সুন্দরী রমণী দর্শনমাত্র হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মুহূর্তের তরে কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মত উচ্চবংশীয় জ্ঞানবান ব্যক্তি যে সেইরূপ ইতর জনোচিত কুকর্মে ডুবে ছিলেন, এ কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ কখনই আত্মগোপন করেন নাই; তিনি নিজ মুখেই নিজের ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করেছেন। তিনি যখন ঈশ্বর, তখন অবশ্যই বলতে হবে, গোপগণ তাঁহার পুত্র, গোপিনীগণ তাঁহার পুত্রবধূ অথবা কন্যা। এরূপ অবস্থায় তিনি যে গোপ রমণীদিগকে ভুলিয়ে উপপত্নীত্বে গ্রহণ করেছেন, ইহা কীসে বিশ্বাস করা যায় ? গ্রন্থকার ভগবানকে আত্মারাম বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আত্মা হলেই আপনা হলো। সুতরাং তাঁহাতে আর গোপগণেতে ভেদ ছিল না। এই অসংলগ্ন অর্থে যদি তিনি গোপরমণী দিগকে উপপত্নী করতে পারেন, তবে অন্য কোনো লোকে পারবে না কেন ? সকল জীবেই ত আত্মা আছে; আত্মার ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যদি আত্মার মুলীভূত, তাহা হলে তিনি আত্মাধিক ঈশ্বর-পরমাত্মা। তিনি অবশ্যই জগৎ-পিতা, ধর্মরক্ষক, ধর্মের প্রবর্তক এবং দুষ্টসংহার করে ধর্ম-সংস্থাপন করবার জন্যই মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাহাতে তাঁহার যদি এই প্রকার দস্যু-ব্যবহার ও দুশ্চরিত্রতা থাকবে, তাহলে তিনি অত্যাচারী, লোকপীড়ক অনন্ত দস্যু এবং রাক্ষসরাজ দুষ্ট রাবণকে বধ করবেন কেন ? কৃষ্ণরূপে না হয়ে থাকিলেও তো রাবণ রামরূপে তাঁহারই হাতে নিহত হয়েছে ! শ্রীকৃষ্ণ লোকপীড়ক দস্যু, না বৃন্দাবনে কংস প্রেরিত দৈত্যগণ দস্যু ? দৈত্যগণ লোকদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন নাই, গোপ ও গোপ-শিশুদিগের উচ্ছেদ সাধন করেছেন কি শ্রীকৃষ্ণ ? এই কথা কি প্রকৃত ? তিনি যে গোপদিগকে আশ্রয় করে, যে গোপদিগের যত্নে শৈশব অবস্থা হতে কৈশোর অবস্থা প্রাপ্ত হলেন, সেই গোপদিগের

সর্বনাশ করলেন, তাহাদের কুলে কালী দিলেন; শ্রীকৃষ্ণ কি তবে কৃতঘ্ন, না দস্যু ছিলেন ? তাঁহার ব্যবহার এইরূপ হলে, তাঁহাকে দস্যু অপেক্ষা দস্যু বললেও অত্যুক্তি হয় না। গোপীদিগের প্রতি যদি কৃষ্ণের মত্ততা এবং লোভই থাকত, তবে অক্রুর বৃন্দাবনে এসে সংবাদ দেওয়া মাত্র তিনি মথুরায় চলে যেতে পারিতেন না ? বৃন্দাবনে ফিরে না এসে সেখানে থেকেই পারিতেন না ? গ্রন্থকার গোপীগণের আত্মার সহিত আত্মারামের যেরূপ নিগূঢ় বন্ধন দেখিয়েছেন, অচিরাৎ সেই বন্ধন ছিন্ন করে মথুরায় যাওয়া একান্ত অসম্ভব। ততোধিক অসম্ভব, বৃন্দাবনে সহস্র সহস্র প্রণয়িনীকে বনে জঙ্গলে ফেলে, কৃষ্ণ যে মুহূর্তে মথুরায় গেলেন, তখনই আবার কুঞ্জা নামে আর একটা জঘন্য স্ত্রীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। ইহা অস্বাভাবিক নয় কি ? ইহাতেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হল না; তিনি রাজবাড়ীর রমণীদিগের উপর কটাক্ষ করতে লাগলেন। অনন্তর তিনি এখান হতে দ্বারকায় গমন করলেন। একদিন দেবর্ষি নারদ, সেখানেও গিয়ে দেখেন যে, কৃষ্ণ ষোল হাজার পত্নীতে ষোল হাজার গৃহে ষোল হাজার রূপ ধারণ করে বিহার করতেছেন; এর অতিরিক্ত কতকগুলি বার নারীও তাঁহার কেলি-কলাপের বিষয়ীভূত হয়েছে। বাস্তবিক, এতদ্বারা কৃষ্ণকে যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ও লম্পটরূপে দেখানো হয়েছে, সেই পরিমাণে কিন্তু তাঁহার নির্মল যশ বর্ণিত হয় নাই। এক কৃষ্ণ যে হাজার হাজার, অযুত অযুত, লক্ষ লক্ষ, কৃষ্ণ হতে পারতেন, ইহা নারদমুনি জানিতেন, নারদমুনি যে ইচ্ছা করলে সহস্র সহস্র নারদরূপ-ধারণে সক্ষম ছিলেন, তাহাও কৃষ্ণের অনবগত ছিল না। পুরাকালের যে সমস্ত দৈত্য ও রাক্ষসের কাহিনি আছে, তাহাতেও তাহারা মায়াবলে একজনেই স্বমূর্তিতে বহুরূপ ধারণ করতে পারত বলে জানা যায়। কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণে লিখিত আছে, রাক্ষসরাজ রাবণ বালি তনয় অঙ্গদ-বীরকে শত শত রাবণমূর্ত্তি দেখিয়ে ছিলেন। সুতরাং ঐরূপ মায়ামূর্তি প্রদর্শন সে সময়ে কোন প্রশংসার কর্মই হতো না। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্রে রাশি রাশি কলঙ্ক ঢেলে দিয়ে সেই কর্মগুলিই আবার দোষাবহ নয়, বলে মায়ামূর্তি ও বিশ্বরূপ সাজিয়ে স্তব করাতো যে ভগবান প্রীত হলেন, কখনই এরূপ নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ স্বভাবে কার্যত দুশ্চরিত্রতা ও দস্যুতা কল্পনা করে তাঁহার নাম দিয়েছেন জগৎস্বামী এবং ব্যক্ত করেছেন জগতে যত রমণী আছে, রমানাথ সকলেরই স্বামী; সুতরাং তাঁহার সংসর্গ অবৈধ নহে। যদি জগৎস্বামী নামের এই অর্থই প্রকৃত হতো, তাহলে শঙ্খাসুরের স্ত্রীর সতীত্ব ধ্বংস হলো কীরূপে ? সুতরাং জগৎস্বামী নামের অর্থ জগতের পালনকর্তা, স্রষ্টা, জগতের শান্তিরক্ষক, ধর্মরক্ষক। জগৎস্বামী নামে গ্রন্থকারের স্বার্থ, সম্প্রদায় গঠন করা, শ্রীকৃষ্ণকে কোটি কোটি

পরস্ত্রীতে আসক্ত দেখানো। সেই সম্প্রদায়ের শান্তিসুখের নিমিত্ত, আবার এই সূত্রে কেউ দোষ কীর্তন করতে না পারে, তার জন্য তাঁহার নাম করা আবশ্যক হয়েছে আত্মারাম, জগৎস্বামী এবং রমানাথ। তদন্যথায় তাঁহার নৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো না। শ্রীকৃষ্ণের নির্দোষ-চরিত্রে ঘোরতর কলঙ্ক রচনা দ্বারা আদর্শরূপ ভিত্তি স্থাপন করলে, সম্প্রদায়-গঠনের গুরুগিরিতে পসার বাঁধিয়া লওয়ার উত্তম সুবিধা, চিন্তা করেই বোধ হয় ব্যাসদেবের নামে এই গ্রন্থ করা হয়েছে। কৃষ্ণ চরিতের অনুকরণে গঠিত-সম্প্রদায় হিন্দুগণের মধ্যে সাদরে গৃহীত হবে এটাই ছিল শ্রীমদ্ভাগবতকারের উদ্দেশ্য; তাহাই সফল হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকারের কল্পনারূপ কলঙ্কিত কৃষ্ণ-চরিতানুকরণে যে সম্প্রদায় হিন্দুদিগের মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহারাই পূর্বে গ্রন্থকারের শিষ্য পসার ছিল, তাহাদের হিতার্থে এবং তাঁহার উত্তরোত্তর সুযোগ-সুবিধার জন্য তিনি ওইরূপ অসঙ্গত লেখনী চালনে ব্রতী হয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যদি সহস্র সহস্র গোপাঙ্গনার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অবৈধ সংসর্গের ছড়াছড়ি না থাকত, তাহলে বৈরাগী সম্প্রদায় কখনও গৃহস্থাশ্রম হতে শত শত স্ত্রীলোক বাহির করে নিয়ে, বৈরাগিণী নামে উপপত্নীরূপে প্রকাশ্যে ব্যবহার করতে পারত না; শ্রীমদ্ভাগবতে যদি শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহার, কুঞ্জাগ্রহণ না থাকত, তবে বৈরাগীরাও তাঁহার অনুকরণে শত শত বৈরাগিণী রাখতে পারত না এবং শ্রীমদ্ভাগবতে যদি শ্রীকৃষ্ণের সেই সহস্র সহস্র গোপীদিগের সংসর্গে জাত জারজ সন্তানের কথা লেখা থাকত, তাহলে বৈরাগী সম্প্রদায়ের গুরু মহাত্মারা, তাহাদের জারজ সন্তানসহ অচল থাকবে, এই ব্যবস্থা বাহির করে দিয়ে, লক্ষ লক্ষ বৈরাগী বৈরাগিণীকে নিঃসন্তানাবস্থায় রাখতে ও তাহাদের অভাবে ত্যক্তসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে কখনই সুবিধা পেতেন না। কাজেই বলতে হবে যে, সর্ব্ববয়বে, সমস্ত লক্ষণে আধুনিক বৈরাগী-সম্প্রদায়-গঠন, হিন্দুদলের মধ্যে তাহাদের সাদরে গ্রহণ, উহাদের শান্তিসুখ এবং ইহাই দেখিয়ে ক্রমশ সম্প্রদায় বৃদ্ধি করার নৈতিক উদ্দেশ্যে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বালক বয়সের সময় তাঁহার উপর অপ্রাসঙ্গিকরূপে ঘোরতর কলঙ্ক চাপিয়ে, বৈরাগী সম্প্রদায়ের ব্যবস্যা সংস্থাপন করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে যদি কৃষ্ণের লক্ষ লক্ষ উপপত্নী গ্রহণের কথা না থাকত, তাহলে কি খৃষ্টান-পাদ্রীরা আমাদের ঈশ্বর কৃষ্ণ-চরিত্রের দোষ কীর্তন-পূর্বক স্থানে স্থানে বক্তৃতা-প্রদানে হিন্দু-সন্তানদিগকে খৃষ্টান করতে পারতেন ? পুনরপি বলি, ভগবানের কুৎসা বা কলঙ্ক, পাঠ, শ্রবণ অথবা মনে চিন্তা করলেও মহাপাতক জন্মে, সেই গুরএতর পাতক হতে কাহারও নিষ্কৃতি পাবার উপায় নাই। অতএব এ বিষয়ে সকলেরই সাবধান থাকা একান্ত কর্তব।

— ☆ —

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অনেকেই বলে থাকেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এই তিনটা লোক নিতান্ত ধর্ম-পরায়ণ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি ধর্মরক্ষক হবেন, তাহলে রণক্ষেত্রে অন্যকে ছল, প্রতারণা ও মিথ্যা কথা বলতে প্রবৃত্তি দিয়ে ঐ তিনটা ধার্মিক লোকের, বিশেষত দ্রোণাচার্য ব্রাহ্মণের প্রাণ অন্যায়রূপে ও অধর্মাচরণে বধ করাইলেন কেন ? সুতরাং কখনই শ্রীকৃষ্ণকে ধর্মরক্ষক বা ধর্মপালক বলা যেতে পারে না।

এই সম্বন্ধে বিচার করা আবশ্যক হলে, আদ্যন্ত সমস্ত কথার আলোচনা না করে ঐ ব্যক্তি তিনটাকে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে ধার্মিকরূপে দেখলেই কি সুবিচার হতে পারে ? দেখতে হয়, কুরুপাণ্ডবদিগের বিবাদ কি নিমিত্ত ? যে রাজত্ব নিয়ে বিবাদ, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই রাজ্য কাহার ? উহার মূল মালিক ছিলেন বিচিত্রবীর্য। তিনি অকালে পরলোক গমন করলে, তাঁহার দুই স্ত্রীর গর্ভে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে পরাশরনন্দন ব্যাসদেব দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। তাহার একজনের নাম পাণ্ডু, অন্যজনের নাম ধৃতরাষ্ট্র। ধর্মশাস্ত্রানুসারে জন্মান্ধতার কারণে ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হওয়াতে, পাণ্ডুই সমগ্র পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী হন এবং সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করে বসেন। বহুকাল রাজ্য-ভোগের পর রাজা পাণ্ডুর মৃত্যু হলে, শাস্ত্রমতে তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠিরাদিতেই সম্পত্তির অধিকারিত্ব রয়েছে। কিন্তু ঘটনা বশত তাঁহাদের ভাগে সহজে সে সুখ ঘটে উঠল না। যে ভীষ্ম উভয় পক্ষেরই পিতামহ, বহুকাল পর্যন্ত পাণ্ডু-রাজের অন্নেই যাঁহার শরীর পুষ্ট, তাঁহাকে সহায়বল অবলম্বন করে, ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্র দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে প্রাণে বধ করার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা পান। তাঁহারা তাঁহাদিগকে কৌশলক্রমে বনে পাঠান, এবং সেখানে পাণ্ডুরাজার পরিত্যক্ত ধন দ্বারাই জতুগৃহ প্রস্তুত করিয়ে চতুরতা পূর্বক পুড়িয়ে মারতে উদ্যোগী হন। ন্যায়ানুসারে কিন্তু ভীষ্ম অবাধে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবকে, স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। তিনি তা না করে পাপিষ্ঠ দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বী হওয়াতে, দুর্যোধনের অবলম্বনে তাঁহাদের প্রাণ-নাশে যথোচিত চেষ্টা পেলেন।

অবশেষে তাঁহারা যদিও ইন্দ্রপ্রস্থে স্বতন্ত্র বাড়ি প্রস্তুত করে তাহাতে বাস করতে ছিলেন, তাহাতেও তাঁহাদের অদৃষ্টে সুখ হলো না। দুর্বুদ্ধি, লোভী, হিংসক দুর্যোধন পাশাখেলায় পরাজিত করে পাণ্ডবদিগের ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন পূর্বক যত কিছু অসম্মান করে ছিলেন, তা সমস্তই ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের অনুধুলে। যুদ্ধক্ষেত্রেও ভীষ্ম দুষ্ট দুর্যোধনেরই সেনাপতি হয়ে প্রতিদিন দশ হাজার লোকের ও অশ্ব হস্তী আদি অগণিত

পশুর প্রাণ সংহার করেছেন। বস্তুত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ইহারা তিনজনে প্রতিকূলাচারী হয়ে পাপিষ্ঠ দুর্যোধনের সহায়তা না করলে, কদাপি পুঞ্জে পুঞ্জে অত লোকক্ষয় হতো না, এবং যুধিষ্ঠিরাদির রাজ্যলাভেও কোন বিঘ্ন ঘটত না।

ধর্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করে অধর্মাচরণে, ঐ তিন ব্যক্তি দুষ্ট-দস্যু দুর্যোধনকে রাজত্ব দিলেন এবং লোকক্ষয়মানসে, পৃথিবী জনশূন্য করতে প্রবৃত্ত হলেন, ইহা ভগবানের চক্ষে নিদারুণ কষ্টের কারণ হলো। তিনি যখন দেখলেন যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের সহায়তাতেই দুষ্ট দুর্যোধন বলিষ্ঠ হয়ে, ন্যায্য প্রাপক পাণ্ডবদিগকে রাজ্যলাভে বঞ্চিত করতেছেন, তাঁহারা সাহায্যকারী না হলে, দুর্যোধন কখনই অন্যায় পূর্বক পরসম্পত্তি হস্তগত করে দস্যুতায় প্রবৃত্ত হতে পারতেন না এবং ভারতবর্ষও জনপ্রাণিশূন্য হতো না, তখনই ইহাদের বধের উপায় উদ্ভাবন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলে তাঁহার মনে হলো; তিনি তাহা কার্যে পরিণত করালেন। জগতে নিজে দুষ্ট, দস্যু, অধার্মিক, পরধন-পরসম্পত্তি-অপহারক হওয়াও যে কথা, ঐরূপ প্রকৃতিমান লোকের সহায়তা করাও ঠিক সেই কথা; উভয়তই তুল্য পাপ। সুতরাং দুষ্ট দুর্যোধন কর্তৃক যে সকল গুরুতর পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেই সমস্ত কর্মের পরিপোষকরূপী ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণও যে উপেক্ষিতব্য নয়, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই পাপেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সংহার করিয়ে ন্যায়ানুসারে যাঁহাদের পৈতৃক রাজ্য, তা তাঁহাদিগকে দিয়েছেন, তাহাতে ধর্ম সংস্থাপন করেছেন এবং প্রাণিক্ষয় নিবারণ করেছেন। সুতরাং এই লোকহিতকর কার্যে ভগবানকে ধার্মিক, ধর্মরক্ষক ও ধর্মপোষক বলা অবশ্য কর্তব্য। সিংহ ব্যাঘ্রাদি জাতীয় একটা মাত্র হিংস্র জন্তর বিনাশে যেমন অনন্য প্রাণীর প্রাণ রক্ষা হয়, ভীষ্মাদির বধেও ভগবান সেই ফল ফলিয়েছেন, তাঁহাদের পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। এ কর্মে শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম যশ ও পুণ্য ভিন্ন, কখনই পাতক হয়েছে বলে মনে স্থান দেওয়া সঙ্গত নহে॥

সম্পূর্ণ

অন্ধভক্তিতে-অন্ধবিশ্বাসে কখনো ধর্ম হয় না !